ফেলুদার অভিযান

২



সত্যজিৎ রায়

ছোটোদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধি রোড ■ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
সোমনাথ বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ সন্দীপ রায়

বর্ণসংস্থাপন ঃ
ইউনিভার্সাল লেজার গ্রাফিক্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রণ ঃ
দ্বিজেন্দ্র অফসেট
২০/৩ পুলিন অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০০৮১

ফেলুদার অভিযান

২

এই লেখকের অন্যান্য বই

ফেলুদার অভিযান
প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযান
তারিণী খুড়োর অভিযান
বারোভূতের গপ্‌পো
গোরস্থানে সাবধান
গ্যাংটকে গন্ডগোল
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
ফেলুদা এন্ড কোং
বাক্স-রহস্য
প্রোফেসর শঙ্কু
বাদশাহী আংটি
এক ডজন গপ্‌পো
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু
কৈলাসে কেলেঙ্কারি
শঙ্কু একাই ১০০
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু
আরো এক ডজন
জয় বাবা ফেলুনাথ
আরো বারো
এবারো বারো
হত্যাপুরী
ছিন্নমস্তার অভিশাপ
ফটিকচাঁদ
যখন ছোট ছিলাম
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে
সেরা সন্দেশ (সম্পাদিত)
বিষয় চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)
একেই বলে শুট্যিং
কাঞ্চনজঙ্ঘা (চিত্রনাট্য)
নায়ক (চিত্রনাট্য)
ইত্যাদি

ফেলুদার অভিযান ২ ▢ সূচিপত্র





রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফর্সা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরোনো নেপালি আর তিব্বতী জিনিস-টিনিসের যে দোকানটা আছে, সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘণ্টার মত বসে সন্ধে হব হব হলে জালাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'কেহে তুমি, পেছু নিয়েছ?' আমি বললাম, 'আমার নাম তপেশ রঞ্জন দত্ত।' 'তবে এই নাও লজঞ্চুস' বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমনড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর দিয়ে বললেন, 'একদিন সকালে এসো না আমার বাড়িতে—অনেক মুখোশ আছে, দেখাবো।'

সেই রাজেনবাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করবে?

ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।

'পাকামো করিসনে। কার কী করে বিপদ ঘটবে না- ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায়?'

আমি দস্তুরমত রেগে গেলাম।

'বারে. রাজেনবাবু যে ভালো লোক সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না? তুমি ত তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধি ত তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালি বস্তীতে গিয়ে গরীবদের কত সেবা করেছেন জান?'

'আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কচি খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে?'

কচি খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারণ আমার বয়স সাড়ে তেরো বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডবল।

সত্যি বলতে কি— ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল্-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম—আজ রবিবার, ব্যাণ্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু আনন্দবাজার পড়ছিলেন, আর আমি কোনরকমে উঁকিঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাকাশে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ্ করে তিনকড়িবাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, 'কী হল, চড়াই উঠে এলেন নাকি?

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'আরে না মশাই। এক ইন্‌ক্রেডিব্‌ল ব্যাপার!'

ইন্‌ক্রেডিব্‌ল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে 'অবিশ্বাস্য'।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'এই দেখুন না।'

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে তিনকড়িবাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।



আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উল্‌টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুণগুণ করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোন ইণ্টারেস্টই নেই কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা অমি শুনতে পেয়েছিলাম।

'সত্যিই ইন্‌ক্রেডিব্‌ল। আপনার ওপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এ ভাবে শাসিয়ে চিঠি লিখবে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'তাই ত ভাবছি। সত্যি বলতে কি, কোনদিন কারুর অনিষ্ট করেছি বলে ত মনে পড়ে না।'

তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'হাটের মাঝখানে এসব ডিসকাস না করাই ভালো। বাড়ি চলুন।'

দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিচুক্ষণ ভুরু কুঁচকে গুম হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'তুই তাহলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে?'

'বারে—তুমিই ত রহস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে অনেক ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।'

'তা ত বটেই। এই ধর—আমি ত আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোনদিকের বেঞ্চে বসেছিলি।'

'কোন দিক?'

'রাধা রেস্টুরেন্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে।'

'আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?'

'আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝল্‌সেছে, ডানটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চগুলির একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।

'ইনক্রেডিব্‌ল!'

'যাক্ গে। এখন কথা হচ্ছে—রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয়?'

'হবেই, ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা ত?'

'হ্যাঁ—কিন্তু বেশি জোরে না। জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য—সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরো তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময়?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়ট! ফেরার সময় ত ঢালু নামতে হয়। তুই নিশ্চয়ই ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড়া বড়া স্টেপস ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস সেবার কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালু নামতে মানুষে বড় বড় পা ফেলে প্রায় দৌড়নর মত। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক কষে কষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয়—তা না হলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোন্ বাড়ি থেকে রেডিও-[illegible] গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিং বেল টিপল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পীক-টি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে, একটি কথা বলবিনে।'

'কিছু জিগ্যেস করলেও না?'

'শাটাপ্!'

একটা নেপালি চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আঈয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরোনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন। কলকাতায় বেশ নামকরা উকিল ছিলেন।



চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে চারিদিকে দেয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাঁত খিঁচানো চোখ রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরোনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এইসব। কাপড়ের উপর কাজ করা বুদ্ধের ছবিও আছে—কত পুরোনো কে জানে? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা সেটা এখনও ঝলমল করছে। আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম। ফেলুদা দেয়ালের এদিক ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মর্চে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে ঢিপ্ করে এক পেন্নাম ঠুকে বলল, 'চিনতে পারছেন? আমি জয়কৃষ্ণ দত্তর ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথমে চোখ কপালে তুললেন, তারপর চোখের দুপাশ কুঁচকিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'বা-বা! কত বড় হয়েছো, তুমি, অ্যাঁ? কবে এলে এখানে? বাড়ির সব ভালো? বাবা এসেছেন?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি—কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বলল না সে রাজেনবাবুকে চেনে?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে এই সাত দিন আগে আমাকে লজঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখন ত প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার?'

'এইত—মাস ছ'এক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটা বলে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি..'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদেব সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু জ্ঞানেশ সেন, অ্যাডভোকেট্ হচ্ছেন তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘরভাড়া দেবো শুনে জ্ঞানেশই তিনকড়িকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় উনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল আমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারত যে রাজেনবাবু হয়ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ্য করছি বেশি। পাহাড়ে ঠাণ্ডাটা আরেকটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গানবাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ্য করছি যে লাঠির উপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর গানটার সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভালো শ্যামা-সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে লেখা চিঠি নয়। নানান জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে তবে চিঠিটা লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে, তা হল এই—'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক— বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কী আর বলব বলো! কোনদিন কারুর প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে ত মনে পড়ে না।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম করতে পারেন?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন অসুখ-বিসুখ হলে'....

'কেমন লোক বলে মনে হয়?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারণ স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায় না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারণ—সর্দি জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না।'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন?'

'তা নেন বইকি। আর আমারও ত পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অব্‌লিগেশনে যাই কেন?'

'আর কে আসেন?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে একটি ভদ্রলোক যাতায়াত... এই দ্যাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, স্যুট পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলুম বলে মন হল যে!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এই মাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনার ও আমার মত পুরোনো জিনিসের শখ সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—

নমস্কার-টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল—পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল—রাজেনবাবুকে বললেন,

'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোঁজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ—আজ শরীরটা ভালো ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চান না। ফেলুদাও মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং····আসলে আপনার ওই তিব্বতী ঘণ্টাটা একবার দেখার ইচ্ছা ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সেতো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'



রাজেনবাবু ঘণ্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক দেয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোন এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। আমার ব্যবসার জন্য প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি কিউরিও সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম 'কিউরিও' মানে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘণ্টাটা নিয়ে এলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। বললেন, নিচের অংশটা রুপোর তৈরি, হাতলটা তামা আর পেতল মেশানো, আর তার উপরে লাল নীল সব পাথর বসানো।

অবনীবাবু বললেন, 'কী মনে হয়?'

'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরোন জিনিস।'

'আপনি বল্লে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকে না। দোকানদার বলে এটা নাকি একেবারে খোদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'

'কিছুই আশ্চর্য না।····আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজি নন? মানে, ভালো দাম পেলেও?'

রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন? শখের জিনিস—ভালোবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, বা এমন কি কেনা দরেও বেচব—এ ইচ্ছে আমার নেই।'

অবনীবাবু ঘণ্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশাকরি বেরোতে পারবেন একবার।'

রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে ত আছে।'

অবনীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'কটা দিন একটু না বেরিয়ে-টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি?'



সেটাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জান? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা—যাকে বলে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক।'

'যদ্দিন না সেটা সম্বন্ধে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না। আপনাব নেপালি চাকরটা কদ্দিনের?'

'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কমপ্লীটলি রিলায়েব্‌ল।'

ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন?'

'সকাল বিকেল ঘণ্টাখানেক একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি আর কি। কিন্তু বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়োমানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি? আমার বয়স হল চৌষট্টি, রাজেনবাবুর চেয়ে এক বছর কম।'

রাজেনবাবু বললেন, 'তিনি চেঞ্জে এসেছেন, ওঁকে আর বাড়িতে বন্দি করে রাখার ফন্দি করছ কেন তোমরা? আমি থাকব, আমার চাকর থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরাও চাও ত দুবেলা খোঁজখবর নিয়ে যেও এখন।'

'বেশ তাই হবে।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লুম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উল্টোদিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর সেই তাকের উপর তিনটে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমরা স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কী বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে সেইটে বোঝানোর জন্য এই ছবি।

উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলে-পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট।'

সত্যি, ভারী ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলেবয়সে।

'অবিশ্যি, ছবি দেখে ভুলো না দুরন্ত বলে ভাবী বদনাম ছিল আমার। শুধু যে মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস্ এ আমাদের বেস্ট্ রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা একজন ফেলুদার বয়সী ছেলের। রাজেনবাবু বললেন সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায়?'

রাজেনবাবু গলা খাঁক্‌রিয়ে বললেন, 'জানি না ঠিক। বহুকাল দেশ ছাড়া। প্রায় সিক্সটিন ইয়ার্স।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই?'

'নাঃ।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ভারি ইন্টারেস্টিং কেস।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারেই বই এর ডিটেকটিভের মত কথা বলছে।

বাইরেটা ছমছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নিচের দিকে দেখে মনে হল রংগীত উপত্যকা থেকে কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। রাজেনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি—একটু যে নার্ভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ-চিঠি যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার—তোমাকে তুমি বলেই বলছি— তোমার অবজারভেসনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্‌প্রেসড হইচি। ডিটেক্‌টিভ গল্প আমিও অনেক পড়িচি। এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়ত তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'এই যে টুক্‌রো টুক্‌রো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে। এর থেকে কী বুঝলে বলত?'

ফেলুদা কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বলল 'এক নম্বর-- কথাগুলো কাটা হয়েছে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে—কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড।'

'দুই নম্বর—কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেওয়া হয়েছে—কারণ হরফ ও কাগজে তফাৎ রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেই সব বই সম্বন্ধে কোন আইডিয়া করেচ?'

'চিঠির দুটো শব্দ 'শান্তি' আর 'প্রস্তুত' —মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দবাজার।'

'তাই বুঝি!'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দবাজারেই ব্যবহার হয়- অন্য বাংলা কাগজে নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনটাই পুরোন বই থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে মাত্র পনের বিশ বছর হল। আর যে আঠা দিয়ে আঁটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন ধারণা করেছ?'

'গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মত।'

'চমৎকার ধরেছ।'

'কিন্তু আপনিও ত ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেকটিভ কথাটার মানে জানতুম কিনা সন্দেহ!'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'রাজেনবাবুর মিষ্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু এই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেলো।'

আমি বললাম, 'তাহলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'আচ্ছা—বাংলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালোই লাগল। ফেলুদার মত বুদ্ধি আশা করি তিনকড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

'কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?'

'অপরা

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

'লোকটাকে দেখলি?'

'কই, না ত। মুখ দেখিনি ত।'

'ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল —' ফেলুদা আবার থেমে গেল। 'কি মনে হল ফেলুদা?'

'না। বোধহয় চোখের ভুল। চ— পা চালিয়ে চ— খিদে পেয়েছে।'

২

ফেলুদা হল আমার খুড়তোত দাদা। ও আর আমি আমার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং এ বেড়াতে এসে সেই শহরের নীচের দিকে স্যানাটোরিয়ামে উঠেছি।



স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি বাঙালি বাবা তাদেরই মধ্যে থেকে সমবয়সী বন্ধু টন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তাস টাস খেলে গল্প টল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। আমি আর ফেলুদা কোথায় যাই, কী করি, তাই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। উঠে দেখি বাবা রয়েছেন, কিন্তু ফেলুদার বিছানা খালি। কী ব্যাপার?

বাবাকে জিগ্যেস করতে বললেন, 'ও এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি। আজ দিনটা পরিষ্কার দেখে বোধহয় আগেভাগে বেরিয়েছে।

আমি কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করছিলুম যে ফেলুদা তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর সেই কাজেই বেরিয়েছে। কথাটা ভেবে ভারী রাগ হল। আমাকে বাদ দিয়ে কিছু করার কথা ত ফেলুদার নয়।

যাই হোক, আমিও মুখ টুখ ধুয়ে চা টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লেডেন লা রোডে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডটার কাছাকাছি এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমি বললাম, 'বারে, তুমি আমায় ফেলে বেরিয়েছ কেন?'

'শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল— তাই ডাক্তার দেখাতে গেসলাম।

'ফণী ডাক্তার?'

'তোরও একটু একটু বুদ্ধি খুলছে দেখছি।'

'দেখালে?'

'চার টাকা ভিজিট নিল, আর একটা ওষুধ লিখে দিল।'

'ভালো ডাক্তার?'

'অসুখ নেই তাও পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে—কেমন ডাক্তার বুঝেই দ্যাখ, তারপর বাড়ির যা চেহারা দেখলাম, তাতে পসার যে খুব বেশি তাও মনে হয় না।'

'তাহলে উনি কখনই চিঠিটা লেখেননি।

'কেন?'

'গরীব লোকের অত সাহস হয়?'

'তা টাকার দরকার হলে হয় বই কি।'

কিন্তু চিঠিতে টাকা চায়নি।'

'ওই ভাবে খোলাখুলি বুঝি কেউ টাকা চায়?'

'তবে?'

রাজেনবাবুর অবস্থা কাল কি রকম দেখলি বলত?'

'কেমন যেন ভীতু ভীতু।'

'ভয় পেয়ে মনের অসুখ হতে পারে সেটা জানিস?'

'তাত পারেই।'

'আর মনের অসুখ থেকে শরীরের অসুখ?'

'তাও হয় বুঝি?'

'ইয়েস। আর শরীরের অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে সেটা আশা করি তোর মত ক্যাবলারও জানা আছে।'

ফেলুদার বুদ্ধি দেখে আমার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। অবিশ্যি ফণী ডাক্তার যদি সত্যিই এত সব ভেবে টেবে চিঠিটা লিখে থাকে, তাহলে ওরও বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে।

ম্যালের মুখে ফোয়ারার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ফেলুদা বলল, 'কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিওসিটি বোধ করছি।'

'কিউরিও'র মানে আগেই শিখেছিলাম আর 'কিউরিওসিটি' মানে যে কৌতূহল সেটা ইস্কুলেই শিখেছি।

আমাদের ঠিক পাশেই 'নেপাল কিউরিও শপ'। রাজেনবাবু আর অবনীবাবু এখানেই আসেন।

ফেলুদা সটান দোকানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

দোকানদারের গায়ে ছাই রং-এর কোট গলায় মাফলার আর মাথায় সোনালি কাজ করা কালো টুপি। ফেলুদাকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এলো। দোকানের ভেতরটা পুরোনো জিনিসপত্র গিজগিজ করছে, আলোও বেশি নেই, আর গন্ধটাও যেন সেকেলে।

ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভালো পুরোনো তাংখা আছে?'

'এই পাশের ঘরে আসুন। ভালো জিনিস ত বিক্রী হয়ে গেছে সব। তবে নতুন মাল আবার কিছু আসছে।'

পাশের ঘরে যাবার সময় আমি ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'তাংখা কী জিনিস?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'দেখতেই ত পাবি।'

পাশের ঘরটা আরো ছোট –যাকে বলে একেবারে ঘুপ্‌চি।

দোকানদার দেয়ালে ঝোলানো সিল্কের উপর আঁকা একটা বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই একটাই ভালো জিনিস আছে - তবে একটু ড্যামেজড।'

একেই বলে তাংখা? এ জিনিস ত রাজেনবাবুর বাড়িতে অনেক আছে।

ফেলুদা ভীষণ বিজ্ঞের মত তাংখাটার গায়ের উপর চোখ ঠেকিয়ে উপর থেকে নীচ অবধি প্রায় তিন মিনিট ধরে দেখে বলল, 'এটার বয়স ত সত্তর বছরের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত তিনশ বছরের পুরনো জিনিস চাইছি।'

দোকানদার বলল, 'আমরা আজ বিকালে কিন্তু এক লট মাল পাচ্ছি। তার মধ্যে ভালো তাংখা পাবেন।'

'আজই পাচ্ছেন?'

'আজই।'

'এ খবরটা তাহলে রাজেনবাবুকে জানাতে হয়।'

'মিস্টার মজুমদার? ওনার ত জানা আছে। রেগুলার খদ্দের যে দু তিনজন আছেন, তাঁরা সকলেই নতুন মাল দেখতে বিকালে আসছেন।'

'অবনীবাবুও খবরটা পেয়ে গেছেন? মিস্টার ঘোষাল?'

'জরুর!'

'আর বড় খদ্দের কে আছে আপনাদের?'

খাচ্ছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে আমাদের তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন।

আমরা তিনকড়িবাবুর দুদিকে দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম।

তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'ডিটেক্‌শনে তোমার পারদর্শিতা দেখে খুশি হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে দুটো হট্ চকলেট খাওয়াব—আপত্তি আছে?'

হট চকলেটের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে গেল।

তিনকড়িবাবু তুড়ি মেরে একটা বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলে পর তিনকড়িবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। একটা এক্সট্রা কপি ছিল—আমার লেটেস্ট্ বই। তোমায় দিলুম।'

বইয়ের মলাটটা দেখে ফেলুদার মুখটা হাঁ হয়ে গেলো।

'আপনার বই মানে? আপনার লেখা? আপনিই 'গুপ্তচর' নাম নিয়ে লেখেন?'

তিনকড়িবাবু আধ-বোজা চোখে অল্প হাসি হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

ফেলুদার অবাক ভাব আরো যেন বেড়ে গেল।

'সেকি! আপনার সব কটা রহস্য উপন্যাস যে আমার পড়া! বাংলায় আপনার ছাড়া আর কারুর রহস্য উপন্যাস আমার ভালো লাগে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ! ব্যাপারটা কী জান? এখানেও একটা প্লট মাথায় নিয়ে লেখার জন্যই এসেছিলুম। এখন দেখছি বাস্তব জীবনের রহস্য নিয়েই মাথা ঘামিয়ে ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।'

'আমার সত্যিই দারুণ লাক্—আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ হয়ে গেলো।'

'দুঃখের বিষয় আমার ছুটির মেয়াদ সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করছি যাবার আগে তোমাদের আরো কিছুটা হেল্প করে দিয়ে যেতে পারব।'

ফেলুদা এবার তার এক্‌সাইটিং খবরটা তিনকড়িবাবুকে দিয়ে দিল।

'রাজেনবাবুর ছেলেকে আজ দেখলাম।'

'বল কী হে?'

'এই দশ মিনিট আগে।'

'তুমি ঠিক বলছ? চিনতে পেরেছ ত ঠিক?'

'চোদ্দ আনা সিওর। মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলে বাকি দু আনাও পুরে যাবে বোধ হয়।

তিনকড়িবাবু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'রাজেনবাবুর মুখে তার ছেলের কথা শুনেছ?'

'কাল যা বললেন, তার বেশি শুনিনি।'

'আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্পবয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল। রাজেনবাবু তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ছেলেটি গিয়েওছিল তাই। ২৪ বছর বয়স তখন তার। একেবারে নিখোঁজ। রাজেনবাবু অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কারণ পরে তাঁর অনুতাপ হয়। কিন্তু ছেলে কোন খোঁজ-খবর নেয়নি বা দেয়নি। বিলেতে তাকে দেখেছিলেন রাজেনবাবুরই এক বন্ধু। তাও সে দশ-বারো বছর আগে।'

'রাজেনবাবু তাহলে জানেন না যে তার ছেলে এখানে আছে?'

'নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় ওকে না জানানই ভালো। একে এই চিঠির শক তার উপর

তিনকড়িবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। রহস্য উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

ফেলুদা হাসতে হাসতে বলল, 'প্রবীর মজুমদার যে চিঠি লিখে থাকতে পারেন সেটা আপনার খেয়াল হয়নি তো?'

'একজ্যাক্টলি কিন্তু

তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বেয়ারা হট চকলেট এনে টেবিলে রাখতে তিনকড়ি বাবু যেন একটু চাগিয়ে উঠলেন। ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ফণী মিত্তিরকে কেমন দেখলে?'

ফেলুদা একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন।

'সে কি, আপনি কী করে জানলেন আমি ওখানে গেসলাম?'

'তুমি যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আমিও গেসলাম।'

'আমাদের রাস্তায় দেখেছিলেন বুঝি?'

'না।'

'তবে?'

ডাক্তারের ঘরের মেঝেতে একটি মরা সিগারেট দেখে জিজ্ঞেস করলাম

কে খেয়েছে। ডাক্তার ধূমপান করেন না। ফণীবাবু তখন বর্ণনা দিলেন তাতে তোমার কথা মনে হল, যদিও তোমাকে আমি সিগারেট খেতে দেখিনি। কিন্তু এখন তোমার আঙুলের গায়ে হল্‌দে রং দেখে বুঝেছি তুমি খাও।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বলল, 'আপনারও কি ফণী মিত্তিরকে সন্দেহ হয়েছিল নাকি?'

'তা হবে না? লোকটাকে দেখলে অভক্তি হয় না কি?'

'তা হয়। রাজেনবাবু যে কেন ওকে আমল দেন জানি না।'

'তাও জান না বুঝি? দার্জিলিং-এ আসার কিছুদিনের মধ্যে রাজেনবাবুর ধম্মকম্মের দিকে মন যায়। তখন ফণীবাবুই তাকে এক গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন। একই গুরুর শিষ্য হিসেবে ওদের যে প্রায় ভাই ভাই সম্পর্ক হে!'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ফণী মিত্তিরের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?'

'কথা ত ছুতো। আসলে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম।'

'বাংলা উপন্যাস আছে কিনা দেখার জন্য?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমিও দেখেছি, প্রায় নেই বললেই চলে। আর যা আছে তাও আদ্যিকালের।'

'ঠিক।'

'তবে ফণী ডাক্তার অন্যের বাড়ির বই থেকেও কথা কেটে চিঠি তৈরি করতে পারে।'

'তা পারে। তবে লোকটাকে দেখে ভারী কুঁড়ে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে অতটা কাঠখড় পোড়াবে সেটা কেন জানি বিশ্বাস হয় না।'

ফেলুদা এবার বলল, 'অবনী ঘোষাল লোকটা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'বিশেষ সুবিধের লোক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ভারী ওপর-চালাক। আর ওসব প্রাচীন শিল্প-টিল্প কিছু না। ওর আসল লোভ হচ্ছে টাকার। এখন খরচ করে জিনিস কিনেছে, পরে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে পাঁচগুণ প্রফিট করবে।'

'ওর পক্ষে এই হুম্‌কি চিঠি দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?'

'সেটা এখনও তলিয়ে দেখিনি।'

'আমি একটা কারণ আবিষ্কার করেছি।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী কারণ?'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যে দোকান থেকে ওরা জিনিস কেনেন, সেখানে কিছু ভালো নতুন মাল আজ বিকেলে আসছে।'

এবার তিনকড়িবাবুর চোখও জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুঝেছি। হুমকি চিঠি পেয়ে রাজেন মজুমদার ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন আর সেই ফাঁকতালে অবনী ঘোষাল দোকানে গিয়ে সব লুটে-পুটে নিলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!'

তিনকড়িবাবু চকলেটের পয়সা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরা দুজনেও উঠলাম।

উৎসাহে আর উত্তেজনায় আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল।

অবনী ঘোষাল প্রবীর মজুমদার আর ফণী মিত্তির তিনজনকেই তাহলে সন্দেহ করার কারণ আছে!

পনের মিনিটের মধ্যেই মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে ফেলুদা সেই খবরটা জেনে নিল। প্রবীর মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোক সেই হোটেলের ষোল নম্বর ঘরে পাঁচদিন হল এসে রয়েছেন।

৩

বিকেলের দিকে রাজেনবাবুর বাড়িতে যাবার কথা ফেলুদা বলেছিল কিন্তু, দুপুর থেকে মেঘলা করে চারটে নাগাদ তেড়ে বৃষ্টি নামল। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল বৃষ্টি সহজে থামবে না।



ফেলুদা সারাটা সন্ধে খাতা পেনসিল নিয়ে কিসব যেন হিসেব করল। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কী লিখছে, কিন্তু জিগ্যেস করতে সাহস হল না। শেষটায় আমি তিনকড়িবাবুর বইটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। দারুণ থ্রিলিং গল্প। পড়তে পড়তে রাজেনবাবুর চিঠির ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেলো।

আটটা নাগাদ বৃষ্টি থামল। কিন্তু তখন এত শীত যে বাবা আমাদের বেরোতে দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা ফেলুদার ধাক্কার চোটে ঘুম ভাঙল। 'ওঠ্, ওঠ্—এই তোপ্সে—ওঠ্!'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ফেলুদা কানের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'রাজেনবাবুর নেপালি চাকরটা এসেছিল। বলল বাবু এখুনি যেতে বলেছেন—বিশেষ দরকার। তুই যদি যেতে চাস ত—'

'সে আর বলতে!'

পনের মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রাজেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি তিনি ফ্যাকাশে মুখ করে খাটে শুয়ে আছেন। ফণীডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে খাটের পাশটায় বসে, আর তিনকড়িবাবু এই শীতের মধ্যেও একটা হাতপাখা নিয়ে মাথার পিছনটায় দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন।

ফণীবাবুর নাড়ি দেখা হলে পর রাজেনবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই জোরে



নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'কাল রাত্রে—বারোটার কিছু পরে ঘুমটা ভাঙতে বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে আই স এ মাস্ক্‌ড্ ফেস!'

মাস্ক্‌ড্ ফেস! মুখোশ পরা মুখ!

রাজেনবাবু দম নিলেন। ফণী মিত্তির দেখলাম একটা প্রেসক্রিপশন লিখছেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'দেখে এমন হল যে চিৎকার বেরোল না গলা দিয়ে। রাতটা যে কী ভাবে কেটেছে—তা বলতে পারি না!'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জিনিসপত্তর কিছু চুরি যায়নি ত?'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ তবে আমার বিশ্বাস, আমার বালিশের তলা থেকে আমার চাবির গোছাটা নিতেই সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে···· ওঃ—হরিবল্, হরিবল্!'

ফণী ডাক্তার বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার কমপ্লীট রেস্টের দরকার।'

ফণীবাবু উঠে পড়লেন।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'ফণীবাবু কাল রাত্রে রুগী দেখতে গেস্‌লেন বুঝি? কোটের পিছনে কাদার ছিটে লাগল কী করে?'

ফণীবাবু তেমন কিছু না ঘাবড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তারের লাইফ ত জানেনই—আর্তের সেবায় যখন জীবনটাই উৎসর্গ করিচি, তখন ডাক যখনই

আসুক না কেন, বেরোতেই হবে। সে ঝড়ই হোক্, আর বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক।'

ফণীবাবু তার পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। রাজেনবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'তোমরা আসাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেস্লুম, জান। এখন বোধহয় বৈঠকখানায় গিয়ে একটু বসা চলতে পারে।'

ফেলুদা আর তিনকড়িবাবু হাত ধরাধরি করে রাজেনবাবুকে বৈঠকখানায় এনে বসালেন।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'স্টেশনে ফোন করেছিলুম যদি যাওয়াটা দুদিন পেছোন যায়। রহস্যের সমাধান না করে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ওরা বললে এ-টিকিট ক্যানসেল করলে দশ দিনের আগে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

এটা শুনে আমার ভালোই লাগল। আমি চাইছিলাম ফেলুদা একাই ডিটেক্টিভের কাজটা করুক। তিনকড়িবাবু যেন ফেলুদার অনেকটা কাজ আগে আগেই করে দিচ্ছিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমার চাকরটার পাহারা দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি নিজেই কাল দশটার সময় তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওর বাড়িতে খুব অসুখ। বুড়ো বাপ আছে তার এখন তখন অবস্থা।'

ফেলুদা বলল, 'মাস্কটা কেমন ছিল মনে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'খুবই সাধারণ নেপালি মুখোশ, দার্জিলিং শহরেই অন্তত আরো তিন চার শ' খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আমার এই ঘরেই ত আরো পাঁচখানা রয়েছে- ওই যে, দ্যাখো না।'

রাজেনবাবু যে-মুখোশটার দিকে আঙুল দেখালেন, ঠিক সেই জিনিসটা কাল ফেলুদা আমরা জন্য কিনে দিয়েছে।

তিনকড়িবাবু এতক্ষণ বেশি কথা বলেননি, এবার বললেন, 'আমার মতে এবার বোধহয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা প্রোটেক্শন-এরও ত দরকার। কাল যা ঘটেছে তার পরে ত আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে নেওয়া চলে না। ফেলুবাবু, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছেমত তদন্ত চালিয়ে যেতে পার, তাতে তোমায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছি, এবার পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। আমি বরং যাই গিয়ে একটা ডায়রি করে আসি। প্রাণের ভয় আছে বলে মনে হয় না, তবে রাজেনবাবু, আপনার ঘণ্টাটা একটু সাবধানে রাখবেন।'

'আর বোল না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কী হদিস পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্ত। সত্যি বলতে কি, তোমরা হয়ত না এলেও চলত।'

ফেলুদা বলল, 'স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল, এখানে হয়ত চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'আর তাছাড়া আমার চাকরটা খুব ভালো রান্না করে। আজ মুরগীর মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানাটোবিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।'

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।



তারপর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগী দেখতে গিয়েছিলেন। কার্টরোডে একজন ধনী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।'

'তাহলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?'

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'প্রবীর মজুমদার ষোল বছর ইংলণ্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।'

'তাহলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা-সম্ভবই নয়?'

আর ওর টাকার কোন অভাব নেই। তাছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবঙে ঘোড়দৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।'

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরো কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মত করে প্রায় দশ হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ চা-বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে, প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘণ্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমোরের কাছে। রাজেনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।'

'তাহলে রাজেনবাবুর ঘণ্টাটা তেমন মূল্যবান নয়?'

'না।....আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত নটা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।'

'ও। আর মুখোশ পরা লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তাহলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতটা কুঁচকোতে পারে তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্‌টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালাতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানালা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছে এসে আবার মিলিয়ে গেলো।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন আরো অন্ধকার। একটু ঘুম ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় মনে হল কে যেন ঘরে ঢুকেছে।

মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যেদিক থেকে লোকটা আসছে সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে—আর আমার সামনেই এসে দাঁড়ালো যে!

জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তারপর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা—মুখোশ!

আমি যেই চিৎকার করতে যাবো অমনি অন্ধকার শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি—ফেলুদা!

'কিরে—ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

'ওঃ—ফেলুদা—তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি···· ?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টাহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেলো। তারপর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সবকটা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পরত।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না ত। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না? ভালো করে ভেবে দেখত।'

'একটু····একটুস যেন ····চুরুটের গন্ধ।'

'ফেলুদা মুখোশটা খুলে নিয়ে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তিন-তিনকড়িবাবু?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনটারই অভাব নেই। আর তুই লক্ষ্য করেছিলি নিশ্চয়ই—স্টেশনে আসতে যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরুন।'



কিন্তু আসল যেটা রহস্য, সেটা হল—কারণটা কী? রাজেনবাবুকে ত মনে হয় রীতিমত সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তাহলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন? এটার উত্তর বোধহয় আর জানা যাবে না···· কোনদিনও না।'

রাত্রে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সকালে খাবার ঘরে বসে রাজেনবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছি, এমন সময় নেপালি চাকরটা একটা চিঠি নিয়ে এলো। আবার সেই নীল কাগজ—আর খামের উপর দার্জিলিং পোস্ট মার্ক।

রাজেনবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'তুমিই পড়। আমার সাহস হচ্ছে না।'

ফেলুদা চিঠিটা নিয়ে জোরে পড়ল। তাতে লেখা আছে—

'প্রিয় রাজু, কলকাতায় জ্ঞানেশের কাছ থেকে তোমার ঘরের খবর পেয়ে যখন তোমায় চিঠি লিখি তখনও জানতাম না আসলে তুমি কে। তোমার বাড়িতে এসে তোমার ছেলেবয়সের ছবিখানা দেখেই চিনেছি তুমি সেই পঞ্চাশ বছর আগের বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলের আমারই সহপাঠী রাজু!



এতকাল পরেও যে পুরোন আক্রোশ চাগিয়ে উঠতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না। অন্যায় ভাবে ল্যাং মেরে তুমি যে শুধু আমায় হাড্রেড ইয়ার্ডস-এর নিশ্চিত পুরস্কার ও রেকর্ড থেকে বঞ্চিত করেছিলে তা নয়—আমাকে রীতিমত জখমও করেছিলে। বাবা বদলি হলেন তখনই তাই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়াও হয়নি, আর তুমিও আমার মন আর শরীরের কষ্টের কথা জানতে পারনি। তিন মাস পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলাম।

এখানে এসে তোমার জীবনের শান্তিময় পরিপূর্ণতার ছবি আমাকে অশান্ত করেছিল। তাই তোমার মনে খানিকটা সাময়িক উদ্বেগের সঞ্চার করে তোমার সেই প্রাচীন অপরাধের শাস্তি দিলাম। শুভেচ্ছা নিও। ইতি— তিনু (শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়)'


গোয়েন্দা ফেলুদার
রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

গ্রাম—ঘুরঘুটিয়া
পোঃ— পলাশী
শ্রীপ্রদোষ চন্দ্র মিত্র মহাশয় সমীপেষু জেলা—নদীয়া

সবিনয় নিবেদন,

আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই। সেটি আপনি আসিলে জানিতে পারিবেন। আপনি যদি তিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পত্র মারফত জানাইলে বাধিত হইব।

ঘুরঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশী স্টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছ'টা এগার মিনিটে পলাশী পৌঁছোয়। স্টেশনে আমার গাড়ি থাকিবে। আপনি রাত্রে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটায় একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন।

ইতি আশীর্বাদক
শ্রীকালীকিঙ্কর মজুমদার

চিঠিটা পড়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, 'পলাশী মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশী?'

'আর কটা পলাশী আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?' বলল ফেলুদা। 'তবে তুই যদি ভাবিস সেখানে এখনো অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তাহলে খুব ভুল করবি। কিস্যু নেই। এমন কি সিরাজদ্দৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশীর নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।'

'তুমি কি যাবে?'

ফেলুদা চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'বুড়ো মানুষ ডাকছে এ ভাবে!—তাছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা জানারও একটা কৌতূহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পাড়াগাঁয়ে শীতকালের সকাল সন্ধেতে মাঠের উপর কেমন ধোঁয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর গুঁড়ি আর মাথার উপরটা

খালি দেখা যায়···· আর সন্ধেটা নামে ঝপ্ করে, আর তারপরেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আর নাঃ, এসব কতকাল দেখিনি।—তোপসে, দেত দেখি একখানা পোস্টকার্ড।'

চিঠি পৌঁছাতে তিন চার দিন লেগে যেতে পারে হিসেব করেই ফেলুদা যাবার তারিখটা জানিয়েছিল কালীকিঙ্কর মজুমদারকে। আমরা সেই অনুযায়ী ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে পলাশী পৌঁছলাম বারোই নভেম্বর



রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। ট্রেনের কামরা থেকেই ধান ক্ষেতের উপর ঝপ্ করে সন্ধে নামা দেখেছি। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বাতিটাতি জ্বলে গেছে, যদিও আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। কালেক্টরবাবুর কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যে গাড়িটা চোখে পড়ল সেটাই যে মজুমদার মশাইয়ের গাড়ি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম গাড়ি আমি কখনো দেখিনি; ফেলুদা বলল ছেলেবেলায় এক আধটা দেখে থাকতে পারে, তবে নামটা শোনা এটুকু বলতে পারে। কাপড়ের হুডওয়ালা, অ্যাম্বাসাডরের চেয়ে দেড়া লম্বা আমেরিকান গাড়ি, নাম হাপমোবিল। গায়ের গাঢ় লাল রঙ এখানে ওখানে চটে গেছে, হুডের কাপড়ে তিন জায়গায় তাপ্পি, তাও কেন জানি গাড়িটাকে দেখলে বেশ সমীহ হয়।

এমন গাড়ির সঙ্গে উর্দিপরা ড্রাইভার থাকলে মানাত ভাল; যিনি রয়েছেন তিনি পরে আছেন সাধারণ ধুতি আর সাদা সার্ট। গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মজুমদার বাড়িতে যাবেন আপনারা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা, 'ঘুরঘুটিয়া।'

'আসুন।'

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলেন, আমরা চল্লিশ বছরের পুরোন গাড়ির ভিতর ঢুকে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। ড্রাইভার হ্যাণ্ডল মেরে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরঘুটিয়ার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

রাস্তা ভালো নয়, গাড়ির স্প্রিং-ও পুরোন, তাই আরাম বেশিক্ষণ টিকল না। তবুও, পলাশীর বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি খোলা গ্রামের রাস্তায় পড়তেই চোখ আর মন এক সঙ্গে জুড়িয়ে গেল। ফেলুদা ঠিকই বলেছিল; ধানে ভরা ক্ষেতের ওপারে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আর তারই

আশেপাশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মাটি থেকে আট দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধহয় বলে ছবির মতো সুন্দর।

এরকম একটা জায়গায় যে আবার একটা পুরোন জমিদার বাড়ি থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না; কিন্তু মিনিট দশেক চলার পর রাস্তার দুপাশের গাছপালা দেখে বুঝতে পারলাম আম জাম কাঁঠাল ভরা একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তারপর রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে একটা পোড়ো মন্দির পেরোতেই সামনে দেখতে পেলাম নহবৎখানা সমেত একটা শেওলাধরা প্রকাণ্ড সাদা ফটক। আমাদের গাড়িটা তিনবার হর্ন দিয়ে ফটকের ভিতরে ঢুকতেই সামনে বিশাল বাড়িটা বেরিয়ে পড়ল।

পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে লালটাল উবে গিয়ে এখন শুধু একটা গাঢ় বেগুনী ভাব রয়েছে। অন্ধকার বাড়িটা আকাশের সামনে একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার অবস্থা যে প্রায় যাদুঘরে রাখার মতো সেটা কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম। দেয়ালে স্যাঁতা ধরেছে, সর্বাঙ্গে পলেস্তারা খসে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, সেই ইঁটের মধ্যেও আবার ফাটল ধরে তার ভিতর থেকে গাছপালা গজিয়েছে।

আমরা গাড়ি থেকে নামতে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এদিকে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই বোধহয়?' 'আজ্ঞে না', বলল ড্রাইভার, 'তিন বছর থেকে শুনছি আসবে আসবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসেনি।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে উপর দিকে চাইলে দোতলার অনেকগুলো ঘরের জানালা দেখা যায়; কিন্তু তার একটাতেও আলো আছে বলে মনে হল না। ডান দিকে কিছু দুরে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাচ্ছে, যাতে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বোধহয় মালি বা দারোয়ান বা ওইরকম কেউ থাকে ঘরটাতে। মনে মনে বললাম ফেলুদা ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে এ কোথায় এসে হাজির হল কে জানে।

একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাইরের জমিতে। তারপরেই একজন বুড়ো চাকর এসে দরজার মুখটাতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ড্রাইভার গাড়িটাকে নিয়ে গেছে বোধহয় গ্যারেজের দিকে। চাকরটা ভুরু কুঁচকে একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভিতরে আসুন।' আমরা দুজনে তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম।

লম্বায়-চওড়ায় বাড়িটা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আর সবই কেমন যেন ছোট ছোট। দরজাগুলো বেঁটে বেঁটে, জানালাগুলো কলকাতার যে কোনো সাধারণ বাড়ির জানালার অর্ধেক, ছাতটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে বলল দেড়শ দুশো বছর আগের বাংলা দেশের গ্রামের জমিদার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই নাকি এই রকমই ছিল।

লম্বা বারান্দা বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই একটা আশ্চর্য নতুন জিনিস দেখলাম। ফেলুদা বলল, 'একে বলে চাপা-দরজা। ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরী হত। এ দরজা বন্ধ করলে আর খাঁড়া দাঁড়িয়ে থাকেনা, ভাঁজ হয়ে মাথার উপরে সিলিং-এর মতো টেরচা ভাবে শুয়ে পড়ে। দরজার গায়ে যে ফুটোগুলো দেখছিস, সেগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ান হত।'

দরজা পেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা, তার শেষ মাথায় কুলুঙ্গিতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা তিনজনে।

এ ঘরটা বেশ বড়। আরো বড় মনে হত যদি এত জিনিসপত্র না থাকত। একটা প্রকাণ্ড খাট ঘরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে আছে। তার মাথার দিকে বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে তিনটে, একটা এমনি আলমারি, আর মেঝে থেকে ছাত অবধি বইয়ে ঠাসা চারটে পেল্লায় বুক শেলফ। এছাড়া অবিশ্যি খুটিনাটি জিনিসও অনেক রয়েছে। আর রয়েছে খাটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। টেবিলের উপর রাখা একটা মোমবাতির আলো তাঁর মুখে পড়েছে, আর সেই আলোতে বুঝতে পারছি সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন।

'বসুন', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাকি বোসো বলব? তুমি ত দেখছি বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছোট। তুমিই বলি, কী বল?'

'নিশ্চয়ই!'

ফেলুদা আমার কথা চিঠিতেই লিখে দিয়েছিল, এখন আলাপ করিয়ে দিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আমাদের দুজনেরই নমস্কারের উত্তরে উনি কেবল মাথা নাড়লেন।

খাটের সামনেই দুটো পাশাপশি চেয়ারে বসলাম আমরা দুজনে।

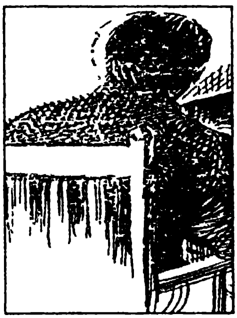
'চিঠিটা পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল নিশ্চয়ই', ভদ্রলোক হাল্কা হেসে জিগ্যেস করলেন।

'নইলে আর অ্যাদ্দুর আসি?''

'বেশ, বেশ।' মজুমদার মশাই সত্যিই খুশি হয়েছেন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। 'না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তাছাড়া তুমিও একটা পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে। অবিশ্যি জানিনা এসব বই তোমার আছে কিনা।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি টেবিলের দিকে ঘুরে গেল। চারটে মোটা মোটা বই রাখা রয়েছে মোমবাতিটার পাশেই। ফেলুদা উঠে গিয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সর্বনাশ, এযে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই। আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে! আপনি নিজে কি কোনকালে—?'

'না', ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি নিজে কোনদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুবাবয়সের একটা শখ বা ''হবি''। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগান হয়। ম্যালকম বলে এক সাহেব-গোয়েন্দা খুনী ধরে দেয়। সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতূহল হয়। তখনই এই সব বই কিনি। সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব শখ হয়। এমিল গ্যাবোরিও-র নাম শুনেছ?'



'হ্যাঁ হ্যাঁ', উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল ফেলুদা, 'ফরাসী লেখক, প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।'

'হুঁ', মাথা নেড়ে বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার, 'তার সব কটা বই আমার আছে। আর তাছাড়া এডগার অ্যালেন পো, কোনান ডয়েল এত আছেই। বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর বা তারও বেশি আগে। তার চেয়ে বেশি আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজকাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে, অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয়ে যেটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় তুমি আরো সরলভাবে, প্রধানতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ। আর বেশ সাক্সেস্‌ফুলি করছ।—কথাটা ঠিক বলেছি কি?'

'সাক্সেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।'

'সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। মোমবাতির স্থির শিখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কালীকিঙ্কর বাবু বললেন, 'আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে তা নয়, আমার শরীরও ভালো নেই।

আমি চলে গেলে এসব বইয়ের কী দশা হবে জানি না। তাই ভাবলাম অন্তত এই কটা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তাহলে এগুলোর যত্ন হবে, কদর হবে।'

ফেলুদা অবাক হয়ে তাকের বইগুলোর দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সবই কি আপনার নিজের বই?'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আর নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

'তাত বটেই। আর্কিয়লজির বই রয়েছে, আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী... এমন কি থিয়েটারের বইও ত দেখছি। তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?'

'তা কিনি বৈকি। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে, তাকে মাসে দু'তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়, তখন লিস্ট করে দিই, ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।'

ফেলুদা টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর দিকে দেখে বলল, 'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন,, 'বইগুলো নিজের হাতে করে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আরো বেশি খুশি হতাম, কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে।'

আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। উনি হাত দুটো কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটার যে কোনো বিশেষ কারণ আছে সেটা বুঝতে পারিনি।

'আরথ্রাইটিস জান ত? যাকে সোজা বাংলায় বলে গেঁটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না। এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে, নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়ে টাইয়ে দেয়।'

'আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?'

'না, ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশীতে ভালো ডাক্তার নেই।'

লক্ষ্য করছিলাম ফেলুদার দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে ঘরের কোনায় রাখা সিন্দুকটার দিকে। ও বলল, 'আপনার সিন্দুকটার একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। তালা চাবির ব্যবস্থা নেই দেখছি। কম্বিনেশনে খোলে বুঝি?'

কালীকিঙ্করবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে; সেই অনুযায়ী নবটা ঘোরালে তবে খোলে। এসব অঞ্চলে এককালে ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল, জান ত। আমার পূর্বপুরুষই ত ডাকাতি করে জমিদার হয়েছে। তারপর আবাব আমরাই ডাকাতেব হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। তাই মনে হয়েছিল তালার বদলে কম্বিনেশন করলে হয়ত আরেকটু নিরাপদ হবে।'

কথাটা শেষ করে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর চাকরের নাম ধরে একটা হাঁক দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো গোকুল এসে হাজির হল। কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'একবার খাঁচাটা আনত গোকুল। এদেব দেখাব।'

গোকুল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটা খাঁচায় একটা টিয়া নিয়ে এসে হাজির। মোমবাতির আলোয় টিযাব চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কালীকিঙ্করবাবু পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলত মা,—ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন—বলত।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর আশ্চর্য পরিষ্কার গলায় পাখি বলে উঠল, 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন!

আমি ত থ। পাখিকে এত পরিষ্কার কথা বলতে কখনো শুনিনি। কিন্তু ওখানেই শেষ না। ওর সঙ্গে আরো দুটো কথা জুড়ে দিল টিয়া—'একটু জিরো!'

তারপর আবার পুরো কথাটা পরিষ্কার করে বলে উঠল টিয়া—'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল 'ত্রিনয়ন কে?'

কালীকিঙ্করবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'সেটি বলব না তোমাকে। শুধু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে সেটা হল একটা সংকেত।

বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখত তুমি সংকেতটা বার করতে পার কিনা। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে সেটা বলে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পার', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ



মানুষেরই স্মরণশক্তি কমে আসে সেটা জানত? বছর তিনেক আগে একদিন সকালে হঠাৎ দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে?— সারাদিন চেষ্টা করেও নম্বরটা মনে করতে পারিনি। শেষটায় মনে পড়ল মাঝরাত্তিরে! নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয় সেটাত বলা যায় না। তাই মনে হয়েছিল ওটা মাথায় রাখাই ভাল। এক আমার ছেলে জানত, কিন্তু সে থাকে বাইরে বাইরে। তাই পরদিনই একটি টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটার একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটিকে পড়িয়ে দিই। এখন ও মাঝে মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে— অন্য পাখি যেমন বলে ''রাধাকৃষ্ণ'' বা ''ঠাকুর ভাত দাও''।'

ফেলুদা সিন্দুকটার দিকে দেখছিল। হঠাৎ ভ্রুকুটি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আবার ফিরে গেল সিন্দুকটার দিকে।

'কী দেখছ ভাই?' বললেন কালীকিঙ্করবাবু। 'তোমার ডিটেকটিভের চোখে কিছু ধরা পড়ল নাকি?'

ফেলুদা সিন্দুকের সামনেটা পরীক্ষা করে বলল, 'আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধহয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।'

কালীকিঙ্করবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?'

ফেলুদা মোমবাতিটা আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

কালীকিঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'বাড়িতে লোক বলতে ত আমি,

গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মনিলাল, ঠাকুর আর মালি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিন পাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবারে এসেছে—ওই যা বললাম—আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার সকালে আমার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে আবার বেঞ্চিতেই পড়ে যাই। রাজেন পলাশী থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। ও পরদিনই ডাক্তার নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে একটা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। যাই হোক—আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই সেটা আমি জানি। এই শেষ কটা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্ধুক ভাঙবে?'

ফেলুদা কালীকিঙ্করবাবুকে আশ্বাস দিল।

'আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে পারে। হয়ত সিন্দুকটা যখন প্রথম বসানো হয়েছিল তখনই ঘষটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরোনো সেটা এই মোমবাতির আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আরেকবার দেখব। আপনার চাকরটি বিশ্বাসী ত?'

'গোকুল আছে প্রায় ত্রিশ বছর।'

'আর রাজেনবাবু?'

'রাজেনও পুরোন লোক। মনে ত হয় বিশ্বাসী। তবে ব্যাপারটা কী জান—আজ যে বিশ্বাসী, কাল সে বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা এমন ত কোনো গ্যারাণ্টী নেই।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে কথাটার সায় দিয়ে বলল, 'যাই হোক, গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয়না চিন্তার কোনো কারণ আছে।'

'যাক!'

কালীকিঙ্কর বাবুকে খানিকটা আশ্বস্ত বলে মনে হল। আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, 'গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। লেপ কম্বল তোষক বালিশ মশারি—সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুরে গেছে—এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়া দাওয়া করে নিও। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।'

ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে বইগুলো নিয়ে নিল। গুড নাইট করার আগে কালীকিঙ্করবাবু আরেকবার হেঁয়ালির কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।—

'ওটার সমাধান করতে পারলে তোমাকে আমার গ্যাবোরিওর সেটটা উপহার দেব।'

২

গোকুল লণ্ঠন হাতে দুটো বারান্দা পেরিয়ে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল।

আগে থেকেই ঘরে একটা লণ্ঠন রাখা ছিল। আমাদের সুটকেশ আর হোল্ড-অলও দেখলাম ঘরের এক কোনে রাখা রয়েছে। কালীকিঙ্করবাবুর ঘরের চেয়ে এ ঘরটা ছোট হলেও, জিনিসপত্র কম থাকাতে হাঁটা চলার জায়গা এটাতে একটু বেশিই। ফরসা চাদর পাতা খাটের উপর বসে ফেলুদা বলল, 'সংকেতটা মনে পড়ছে, তোপ্‌সে?'

এইরে! ত্রিনয়ন নামটা মনে আছে, কিন্তু সমস্ত সংকতেটা জিগ্যেস করে ফেলুদা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

'পারলি না ত? ঝোলা থেকে আমার খাতাটা বার করে সংকেতটা লিখে ফেল। গ্যাবোরিওর বইগুলোর ওপর বেজায় লোভ হচ্ছে।'

খাতা পেনসিল নিয়ে বসার পর ফেলুদা বলল আর আমি গোটা গোটা অক্ষরে লিখে ফেললাম—

'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

লিখে নিজেরই মনে হল এ আবার কিরকম সংকেত। এর ত মাথা মুন্ডু, কিছুই বোঝা যায় না। ফেলুদা এর সমাধান করবে কী করে?

ফেলুদা এদিকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইবে দেখছে। জ্যোৎস্না রাত। বোধহয় পূর্ণিমা। আমি ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা বাড়ির পিছন দিক। ফেলুদা বলল, 'একটা পুকুর-টুকুর গোছের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে ডান দিকটায়।' ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে জল চিক্‌মিক্ করছে সেটা আমিও দেখেছি।

একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। তার সঙ্গে এই মাত্র যোগ হল শেয়ালের ডাক। আমার মনে হল এত নির্জন জায়গায় এর আগে কখনো আসিনি।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, ফেলুদা পাল্লাদুটো বন্ধ করতেই একটা মোটরের আওয়াজ পেলাম। এটা অন্য গাড়ি, সেই বিশাল প্রাচীন আমেরিকান গাড়ি নয়।

'বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্চে', ফেলুদা মন্তব্য করল। তার মানে এবার খেতে ডাকবে। সত্যি বলতে কি বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটার ট্রেন ধরব বলে সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। পথে রাণাঘাট স্টেশনে অবিশ্যি মিষ্টি আর চা খেয়ে নিয়েছিলাম। হয়ত এমনিতে খিদে পেতনা, কারণ

ঘড়িতে বলছে সবেমাত্র আটটা বেজেছে, কিন্তু এখানে ত আর কিছুই করার নেই; এমন কি লণ্ঠনের আলোতে বইও পড়া যাবেনা। তাই মনে হচ্ছিল খেয়ে দেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকতে পারলে মন্দ হয়না।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি রয়েছে, আর ফেলুদা সেটার দিকে চেয়ে আছে। ফোটো নয়। আঁকা ছবি আর বেশ বড়। সেটা যে কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খালি গায়ে বসে আছেন বাবু চেয়ারের উপর; পাকানো গোঁফ, কাঁধ অবধি লম্বা চুল, টানাটানা চোখ, আর বিরাট চওড়া কাঁধ।

'মুগুর ভাজা কুস্তি করা শরীর,' ফিস্ ফিস্ করে বলল ফেলুদা। 'মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।'

বাইরে পায়ের শব্দ। আমরা দুজনেই দরজার দিকে দেখলাম। গোকুল বাইরে একটা লণ্ঠন রেখে গিয়েছিল, তার আলোটা ঢেকে প্রথমে একটা ছায়া ঘরের মেঝেতে পড়ল, আর তারপর একটা অচেনা মানুষ চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ইনিই কি বিশ্বনাথ মজুমদার? না, হতেই পারে না। খাটো করে পরা ধুতি, গায়ে ছাই রঙের পাঞ্জাবী, ঝুঁপো গোঁফ আর চোখে পুরু চশমা। ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বোধহয় আমাদের খুঁজছেন।

'কিছু বলবেন রাজেনবাবু?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেলেন। এবার সর্দি-বসা গলায় কথা এল—

'ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি; গোকুল এসে আপনাদের খবর দেবে।'

রাজেনবাবু চলে গেলেন।

'কিসের গন্ধ বল ত?' আমি জিগ্যেস করলাম ফেলুদাকে।

'বুঝতে পারছিস না? ন্যাফথ্যালীন। গরম পাঞ্জাবীটা সবেমাত্র বার করেছে ট্রাঙ্ক থেকে।'

রাজেনবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝতে পারলাম আমরা কী আশ্চর্য থম্‌থমে পরিবেশের মধ্যে রয়েছি। এরকম জায়গায় দিনের পর দিন মানুষ থাকে কী করে? ফেলুদা পাশে থাকলে সাহসের অভাব হবে না জানি, কিন্তু না থাকলে এই আদ্যিকালের পোড়ো জমিদার বাড়িতে পাঁচ

মিনিটও থাকার সাধ্যি হত না আমার। কালীকিঙ্করবাবু আবার নিজেই বললেন এ বাড়িতে নাকি এককালে খুন হয়েছিল। কোন্ ঘরে কে জানে!

ফেলুদা এর মধ্যে লণ্ঠন সমেত টেবিলটাকে কাছে টেনে এনে খাটে বসে খাতা খুলে সংকেত নিয়ে ভাবা শুরু করে দিয়েছে। দু-একবার যেন ত্রিনয়ন ত্রিনয়ন বলে বিড়বিড় করতেও শুনলাম। আমি আর কী করি দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওটা কী? বুকটা ধড়াস করে উঠল। কী জানি একটা নড়ে উঠেছে বারান্দার ওদিকটায়—যেখানে লণ্ঠনের আলো অন্ধকারে মিশে গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে চেয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে। এবার বুঝলাম ওটা একটা বেড়াল। ঠিক সাধারণ সাদা বা কালো বেড়াল নয়; এটার গায়ে বাঘের মতো ডোরা। বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটা হাই তুলে উলটো দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছু পরেই শুনলাম কর্কশ গলায় টিয়ার ডাক। তারপরই আবার সব চুপচাপ। বিশ্বনাথবাবুর ঘরটা কোথায় কে জানে। তিনি কি দোতলায় থাকেন না একতলায়? রাজেনবাবুই বা কোথায় থাকেন? আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন যেখান থেকে কারুর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না?

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ফেলুদা খাটের উপর পা তুলে দিয়ে খাতা হাতে নিয়ে ভাবছে। আর না পেরে বললাম, 'এরা এত দেরী করছে কেন বলত?'

ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনের মিনিট হয়ে গেল।' বলেই আবার খাতার দিকে মন দিল।

আমি ফেলুদার পাওয়া বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। একটা বই আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে, একটার নাম 'ক্রিমিনলজি', আরেকটা 'ক্রাইম অ্যাণ্ড ইট্স ডিটেকশন'। চার নম্বর বইটার নামের মানেই বুঝতে পারলাম না। তবে এটায় অনেক ছবি রয়েছে, তার মধ্যে পর পর দশ পাতায় শুধু বিভিন্ন রকমের পিস্তল আর বন্দুক। ফেলুদা রিভলভারটা সঙ্গে এনেছে কি?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে পড়ল ফেলুদা ত গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি; আর সেটার কোনো প্রয়োজনও নেই। কাজেই রিভলভারের বা দরকার হবে কেন?

বইগুলো সুটকেসে রেখে খাটে বসতে যাব এমন সময় আচমকা অচেনা গলার আওয়াজ পেয়ে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল।

এবারের লোকটিকে চেনার কোনো অসুবিধা নেই। ইনি গোকুল নন,

রাজেনবাবু নন, গাড়ির ড্রাইভার নন, আর রান্নার ঠাকুর ত ননই। কাজেই ইনি বিশ্বনাথবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'আপনাদের অনেক দেরি করিয়ে দিলাম।' ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন। 'আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।'

সেটা আর বলে দিতে হয় না। বাপের সঙ্গে বেশ মিল আছে চেহারায়। বিশেষ করে চোখ আর নাকে। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে, মাথার চুল এখনও সবই কাঁচা, গোঁফ দাড়ি নেই, ঠোঁট দুটো অসম্ভব রকম পাতলা। ভদ্রলোককে আমার ভালো লাগল না। কেন ভাল লাগল না সেটা অবিশ্যি বলা মুশকিল। একটা কারণ বোধহয় উনি আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন, আর আরেকটা কারণ—যদিও এটা ভুল হতে পারে—ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেও সে হাসিটা কেন জানি খাঁটি বলে মনে হল না। যেন আসলে সত্যি করে আমাদের দেখে খুশি হননি; সেটা হবেন আমরা চলে গেলে পর।



ফেলুদা আর আমি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে নিচে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম খাবার ঘরে। আমি ভেবেছিলাম মাটিতে বসে খেতে হবে—এখন দেখছি বেশ বড় একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে, আব তার উপরে রূপোর থালা বাটি গেলাস সাজানো রয়েছে।

যে-যার জায়গায় বসার পর বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'আমার আবার কী শীত কী গ্রীষ্ম দু বেলা চান করার অভ্যাস, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

ভদ্রলোকের গা থেকে দামী সাবানের গন্ধ পেয়েছি আগেই, এখন মনে হচ্ছে বোধহয় সেন্টও মেখে এসেছেন। বেশ সৌখীন লোক সন্দেহ নেই। সাদা সিল্কের সার্টের উপর গাঢ় সবুজ রঙের হাত কাটা কার্ডিগ্যান, আর তার সঙ্গে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যাণ্ট।

বাটি চাপা ভাত ভেঙে মোচার ঘণ্ট দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম। থালার চারপাশে গোল করে সাজানো বাটিতে রয়েছে আরো তিন রকমের তরকারি, সোনা মুগের ডাল, আর রুই মাছের ঝোল।

'বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

'হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।'

'বই উপহার দিয়ে?'

'হ্যাঁ। আজকের বাজারে ওই বই যদি পাওয়াও যেত, তাহলে দাম পড়ত কমপক্ষে পাঁচ-সাত শো টাকা।'

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেবার কোন মানে হয়না।'

ফেলুদা কথাটার প্রতিবাদ করল।

'কী বলছেন মিস্টার মজুমদার। আমার ত এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনো কথাই ওঠেনা।'

বিশ্বনাথবাবু ফেলুদার কথায় তেমন আমল না দিয়ে বললেন, 'আমার ত এই চার দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানিনা।'

'বাইরে একেবারেই যান না?'

'শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর ওই অন্ধকার ঘরে খাটের উপর শুয়ে থাকেন। দিনে কেবল দুবার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন। এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।'

'আপনি আর কদিন আছেন?'

'আমি? আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনো ডেঞ্জার নেই। আপনারা ত বোধহয় সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরোব।'

ফেলুদা ভাতে ডাল ঢেলে বলল, 'আপনার বাবার ত নানারকম শখ দেখলাম; আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?'

'হ্যাঁ মশাই। কাজকম্ম করে আজকের দিনে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।'

বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন বেজেছে প্রায় সাড়ে নটা। এখানে ঘড়ির টাইমের আব কোনো মানে নেই আমার কাছে কারণ সাতটা থেকেই মনে হচ্ছে মাঝ রাত্তির।

ফেলুদাকে বললাম, 'বালিশ গুলোকে উল্টো দিকে করে শুলে তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

'কেন বল্‌ত?'

'তাহলে আর চোখ খুললেই ডাকাতবাবুটিকে দেখতে হবেনা।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমার কোন আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের চাহনিটা যে আমারও খুব ভালো লাগছিল তা বলতে পারিনা।'

শোবার আগে ফেলুদা লণ্ঠনের আলোটাকে কমিয়ে দিল, আর তার ফলে ঘরটাও যেন আরো ছোট হয়ে গেল।

চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে, তখন হঠাৎ ফেলুদার মুখে ইংরিজি কথা শুনে অবাক হয়ে এক ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। স্পষ্ট শুনলাম ফেলুদা বলল—

'দেয়াব ওয়জ এ ব্রাউন ক্রো।'

আমি কনুইয়ে ভর করে উঠে বসলাম, 'ব্রাউন ক্রো? কাক আবার ব্রাউন হয় নাকি? এসব কী আবোল তাবোল বকছ ফেলুদা?'

'গ্যাবোবিওর বইগুলো বোধহয় পেয়ে গেলাম রে তোপ্সে।'

'সে কী? সমাধান হয়ে গেল?'

'খুব সহজ।.... এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দী শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতগুলো কায়দা বার করেছিল। দেয়াব ওয়জ এ ব্রাউন ক্রো- এই কথাটার সঙ্গে কিন্তু বাদামী কাকের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে—দরওয়াজা বন্ধ্ করো। এই ত্রিনয়নের ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম। গোড়ায় ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।'

'সে কী? ওটা তিন নয় বুঝি? আমিওত ওটাকে তিন ভাবছিলাম।'

'উঁহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। "ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন" হল থ্রি-নাইন-ও থ্রি-নাইন। এখানে "ও" মানে "জিরো" অর্থাৎ শূন্য।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'তাহলে একটু জিরো মানে—'

'এইট-টু জিরো। জলের মত সোজা।—সুতরাং পুরো সংখ্যাটা হচ্ছে—থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু জিরো। কেমন, ঢুকল মাথায়? এবার ঘুমো।'

মনে মনে ফেলুদার বুদ্ধির তারিফ করে আবার বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজতে যাব, এমন সময় আবার বারান্দায় পায়েব আওয়াজ।

রাজেনবাবু।

এত রাত্রে ভদ্রলোকের কী দরকার?

আবার ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে হল, 'কিছু বলবেন বাজেনবাবু?'

'ছোটবাবু জিগ্যেস করলেন আপনাদের আব কিছু দরকার লাগবে কিনা।'

'না না, কিচ্ছুনা। সব ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক যে ভাবে এসেছিলেন সেই ভাবেই আবার চলে গেলেন।

চোখ বন্ধ করার আগে বুঝতে পারলাম জানালার খড়খড়ি দিয়ে আসা চাঁদের আলোটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন। তারপর বেড়ালটা কোত্থেকে জানি দুবার ম্যাও ম্যাও করে উঠল। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি ফেলুদা ঘরের জানালা গুলো খুলছে। বলল 'রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?' রাত্রে যাই হোক্, এখন যে মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে সেটা খাটে শোয়া অবস্থাতেও বাইরের গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারছি।

আমার ওঠার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চা এনে দিল বুড়ো গোকুল। দিনের আলোতে ভালো করে ওর মুখ দেখে মনে হল গোকুল যে শুধু বুড়ো হয়েছে তা নয়; গোকুলের মতো এমন ভেঙে পড়া দুঃখী ভাব আমি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

'কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

গোকুল কানে কম শোনে কিনা জানিনা; সে প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন ফ্যালফ্যাল মুখ করে ফেলুদার দিকে দেখল; তারপর ফেলুদা দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক ঠিক কালকেরই মতো বিছানায় শুয়ে আছেন কম্বলের তলায়। তাঁর পাশের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে বলেই বোধহয় উনি সেটাকে বন্ধ করে রেখেছেন। ঘরটা তাই সকাল বেলাতেও বেশ অন্ধকার। যেটুকু আলো আছে সেটা আসছে বারান্দার দরজাটা দিয়ে। আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম ঘরের দেয়ালে কালীকিঙ্করবাবুর একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে তোলা, কারণ তখনও ভদ্রলোকের গোঁফদাড়ি পাকতে শুরু করেনি।

ভদ্রলোক বললেন, 'গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বার করে রেখেছি, কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা আপনি বলবেন। থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু জিরো। —ঠিক আছে?

'সাবাশ গোয়েন্দা!' হেসে বলে উঠলেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাও, বইগুলো নিয়ে তোমার থলির মধ্যে পুরে ফেল। আর দিনের আলোতে একবার সিন্দুকের গায়ের দাগগুলো দেখ দেখি। আমার ত দেখে মনে হচ্ছেনা ওটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ আছে।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।'

ফেলুদা আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকের লেখা বই চারখানা তার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল।

'তোমরা চা খেয়েছ ত?' কালীকিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ড্রাইভারকে বলা আছে। গাড়ি বার করেই রেখেছে। তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে সুবিধে হয়। রাজেন গেছে বাজারে। গোকুল তোমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেবে।.. তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশে পাশে ঘুরে দেখতে চাও?'



ফেলুদা বলল, 'আমি ভাবছিলাম সাড়ে দশটার ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়ত ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।'

'তা বেশত, তোমাদের মতো শহরের লোকের পল্লীগ্রামে বন্দী করে রাখতে চাইনা আমি। তবে তুমি আসাতে আমি যে খুবই খুশি হয়েছি—সেটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।'

কাল রাত্তিরের বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে যেতে আমি সকাল বেলার রোদে ভেজা ধান ক্ষেতের দৃশ্য দেখছি, এমন সময় শুনলাম ফেলুদা ড্রাইভারকে একটা প্রশ্ন করল।

' স্টেশনে যাবার কি এছাড়া আর অন্য কোনো রাস্তা আছে?'

'আজ্ঞে না বাবু', বলল মনিলাল ড্রাইভার।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি ও কী ভাবছে।, কোনো সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না; কিন্তু সাহস হল না।

রাস্তায় কাদা ছিল বলে দশ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট লাগল স্টেশনে পৌঁছতে। মাল নামিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ফেলুদা কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে গেলনা। মালগুলো স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় রেখে আবার বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তায় সাইকেল রিকশার লাইন। সবচেয়ে সামনের রিক্‌শার মালিকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?'

'জানি, বাবু।'

'চলুন। তাড়া আছে।'

প্রচণ্ড ভাবে প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ণ দিতে দিতে ভিড় কাটিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেলাম। ফেলুদার খ্যাতি যে এখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেটা বুঝলাম যখন সাবইন্‌স্পেক্টর মিস্টার সরকার ওর পরিচয় দিতেই চিনে ফেললেন। ফেলুদা, বলল, 'ঘুবঘুটিযার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন ত।

'কালীকিঙ্কর মজুমদার?' সরকার ভুরু কুঁচকোলেন 'তিনি ত ভালো লোক বলেই জানি মশাই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তার সম্বন্ধেত কোনোদিন কোনো বদনাম শুনিনি।'

'আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?'

'সম্ভবত কলকাতায়। কেন, কী ব্যাপার মিস্টাব মিত্তির?'

'আপনার জীপটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? গোবতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।'

কাদা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে জীপ ছুটে চলল ঘুরঘুটিযাব দিকে। ফেলুদা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মধ্যে শুধু একটিবাব মুখ খুলল, যদিও তার কথা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না।

'আবথ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাফথ্যালীন—সব ছকে পড়ে গেছে রে তোপ্‌সে। ফেলু মিত্তির ছাড়াও যে অনেক লোকে অনেক বুদ্ধি রাখে সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।'

মজুমদার-বাড়ি পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটা দেখে অবাক লাগল সেটা হল একটা কালো রঙেব অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। ফটকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি। জীপ থেকে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'লক্ষ্য কর গাড়িটাতে এখনো কাদা লাগেনি। এ গাড়ি সবেমাত্র রাস্তায় বেরোল।'

বিশ্বনাথবাবুর ড্রাইভারই বোধহয়—কারণ এ লোকটাকে আগে দেখিনি—আমাদের দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে গেটের ধারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আ-আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন?'

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে ফেলুদা আর অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভিতর—তার পিছনে দারোগা, আমি আর একজন কনস্টেবল।

আবার সেই প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে ফেলুদা এবং আমরা তিনজন সোজা ঢুকলাম কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে।

ঘর খালি। বিছানায় কম্বলটা পড়ে আছে। আর যা ছিল সব ঠিক তেমনিই আছে, কিন্তু মালিক নেই।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল ফেলুদা।

সে সিন্দুকটার দিকে চেয়ে আছে। সেটা হাঁ করে খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে অনেক কিছু বার করে নেওয়া হয়েছে।

দরজার বাইরে গোকুল এসে দাঁড়িয়েছে। থরথর করে কাঁপছে। তার চোখে জল। দেখে মনে হয় যেন তার শেষ অবস্থা।

তার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ে ফেলুদা বলল, 'বিশ্বনাথবাবু কোথায়?'

'তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।'

'দেখুন ত মিস্টার সরকার!'

দারোগা আর কনস্টেবল অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেল।

'শোন গোকুল'—ফেলুদা দুহাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ দুটোকে শক্ত করে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'একটি মিথ্যে কথা বললে তোমায় হাজতে যেতে হবে।—কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?'

গোকুলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—তাকে খুন করেছেন।'

'কে?'

'ছোটবাবু।'

'কবে?'

'যেদিন ছোটবাবু এলেন সেদিনই। রাত্তির বেলা। বাপ বেটায় কথাকাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন, কর্তাবাবু বললেন—আমার টিয়া জানে, তার কাছ থেকে জেনে নিও, আমি বলব না। তারপরে—তারপরে—তার কিছুক্ষণ পরে—ছোটবাবু আর তেনার গাড়ির ডেরাইভারবাবু, দুজনে মিলে—'

গোকুলের গলা ধরে এল। বাকিটা তাকে খুব কষ্ট করে বলতে হল—

'দুজনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই পিছনের দীঘির জলে—গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন ছোটবাবু—প্রাণের ভয় দেখিয়ে!'

'বুঝেছি।—আর রাজেনবাবু বলে ত কোনো লোকই নেই, তাই না?'

'ছিলেন, তবে তিনি মারা গেছেন আজ দুবছর হয়ে গেল।'

আমি আর ফেলুদা এবার ছুটলাম নিচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁয়ে ঘুরলেই পিছনের বাগানে যাবার দরজা। বাইরে বেরোনমাত্র মিঃ সরকারের গলায় চিৎকার শুনলাম—

'পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার—আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ।

আমরা দুজনে দৌড়ে গাছ গাছড়া ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নিচে মিঃ সরকার হাতে রিভলভার নিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। তেঁতুল গাছের পরেই কালকের দেখা পুকুরটা—তার জলের বেশির ভাগই সবুজ পানায় ঢাকা।

'লোকটা আগেই লাফ দিয়েছে।' বললেন মিঃ সরকার। 'সাঁতার জানেনা।—গিরীশ, দেখত দেখি টেনে তুলতে পার কিনা।'

কনস্টেবল বিশ্বনাথবাবুকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল। এখন ছোটবাবুর দশা ওই টিয়াপাখির মতো; খাঁচায় বন্দী। সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি গয়নাগাটি



যা নিয়েছিলেন সবই উদ্ধার হয়েছে। লোকটা ব্যবসা করত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জুয়া ইত্যাদি অনেক বদঅভ্যাস ছিল, যার ফলে ইদানিং ধার দেনায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

ফেলুদা বলল, 'কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে—তিনটে লোকই আছেত? নাকি একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাকটিং এর বইগুলোর কথা মনে হল। তাহলে কি

বিশ্বনাথবাবুরই এককালে শখ ছিল থিয়েটারের? তিনি যদি ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়ে থাকেন, অভিনয় জেনে থাকেন, তাহলে এইভাবে এই অন্ধকার বাড়িতে আমাদের বোকা বানানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। হাতটা তাকে কম্বলের নিচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কারণ নিজের হাতকে মেকআপ করে কী করে তিয়াত্তর বছরের বুড়োর হাত করতে হয় সে বিদ্যে তার জানা ছিল না। সন্দেহ একেবারে পাকা হল যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপ পড়েনি।'



আমি কথার ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, ' তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিল কে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বনাথবাবু সেটা জেনেছিলেন। তিনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে তার সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।'

শেষ পর্যন্ত আমাদের দশটার ট্রেনই ধরতে হল।

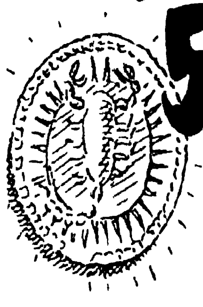
রওনা হবার আগে ফেলুদা তার সুটকেস আর ঝোলা থেকে চারখানা আটখানা বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'খুনীর হাত থেকে উপহার নেবার কোনো বাসনা নেই আমার। তোপ্‌সে, বুকশেল্‌ফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয়ত।'

আমি যখন বই রেখে কালীকিঙ্কর বাবুর ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখনও টিয়া বলছে, 'ত্রিনযন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা



গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার



১

'হ্যালো -- প্রদোষ মিত্র আছেন?'

'কথা বলছি।'

'ধরুন ---পানিহাটি থেকে কল আছে আপনার····হ্যাঁ, কথা বলুন।'

'হ্যালো---'

'কে, মিঃ প্রদোষ মিত্র?'

'বলছি—'

'আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী। আমি পানিহাটি থেকে বলছি। আমি অবিশ্যি আপনার অপরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে আপনাকে টেলিফোন করছি।

'বলুন।'

'আমার ইচ্ছা আপনি একবার আমার এখানে আসেন।'

'পানিহাটি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি। গঙ্গার উপরে আমাদের একটা একশো বছরের পুরোনো বাড়ি আছে। নাম অমরাবতী। এখানে সকলেই জানে। আপনার কাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং আপনারা যে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন তাও আমি জানি। আমি আপনাদের তিনজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে—এই ধরুন দশটা নাগাদ—রাত্তিরটা থেকে আবার রবিবার ফিরে যাবেন।'

'কোনো অসুবিধায় পড়েছেন কি? মানে আমার পেশাটাত জানেন; কোনো রহস্য—?'

'তা নাহলে আপনাকে ডাকব কেন বলুন? তবে সে বিষয়ে আমি ফোনে বলব না, আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা আপনাদের ভালোই লাগবে, ভালো ইলিশ মাছ খাওয়াব, যদি ভিডিও ক্যাসেটে ছবি দেখতে চান তাও দেখাব, আর তার উপরে আপনার মস্তিষ্ক খাটানোর খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।'

'আমার অবিশ্যি এখন এমনিতে কোনো এন্‌গেজমেন্ট নেই-—'

'তাহলে চলে আসুন—দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।'

'কী?'

'এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাইনা—একটা বিশেষ কারণে।'

'ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?'

'সেটার হয়ত প্রয়োজন নেই। আপনি ত ফিল্মস্টার নন। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু আপনাদের তিনজনের জন্য তিনটি ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।'

'কিরকম?'

'আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর কথা পরে জানবেন, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি যে তার একটা জীবনী লেখা এমনিতেও বিশেষ দরকার। আপনি যদি ধরুন তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।'

'ভেরি গুড। আর আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলী।'

'আপনার বাইনোকুলার আছে?'

'তা আছে।'

'তাহলে ওঁকে পক্ষিবিদ করে দিন না। আমার বাগানে অনেক পাখি আসে, ওঁর একটা অকুপেশন হয়ে যাবে।'

'বেশ। আমার খুড়তুতো ভাইটি হবেন পক্ষিবিদের ভাইপো।'

'ব্যাস্, তাহলে ত হয়েই গেল।'

'তাহলে পরশু শনিবার সকাল দশটা?'

'দশটা।'

'অমরাবতী'?

'অমরাবতী। আর আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী।'

ফেলুদাকে অবিশ্যি টেলিফোনের পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য রিপীট করতে হল। বলল, 'কিছু লোক আছে যাদের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভরসা-জাগানো হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব থাকে যে তাদের অনুরোধ এড়ানো খুব মুশকিল হয়।'

আমি বললাম, 'এড়াবে কেন? এঁকে ত এক রকম মক্কেল বলেই মনে হচ্ছে। তোমার রোজগারের কথাটাও ভাবতে হবে ত।'

আসলে ফেলুদার একটা ব্যাপার আছে। পরপর গোটা দু-তিন কেসে ভালো রোজগার হলে কিছুদিনের জন্য গোয়েন্দাগিরীতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে পড়ে। সে জিনিসে অবিশ্যি রোজগার নেই, শুধু শখের ব্যাপার। এখন ওর সেই অবস্থা চলেছে। এখনকার নেশা হল আদিম মানুষ। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার জীবতত্ত্ববিদ্ রিচার্ড লীকির একটা সাক্ষাৎকার পড়ে ও জেনেছে

যে লীকির কিছু আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের উদ্ভবের সময়টা এক ধাক্কায় লাখ লাখ বছর পিছিয়ে গেছে। ফেলুদা এখন আদিম মানুষ ও তার বানর পূর্বাবস্থার ভাবনায় মসগুল। পাঁচবার গেছে মিউজিয়ামে, তিনবার ন্যাশনাল লাইব্রেরী আর একবার চিড়িয়াখানা। একদিন বলল, একটা থিওরিতে কী বলে জানিস? বলে মানুষ এসেছে আফ্রিকার এক বিশেষ ধরণের খুনে বাঁদর থেকে যাকে বলে 'কিলার এপ'। আর সেই কারণেই নাকি মানুষের মজ্জায় একটি হিংস্র প্রবৃত্তি রয়ে গেছে—যেটা প্রকাশ পায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় আর খুন-খারাপিতে।'

পানিহাটিতে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির কোনো নমুনা ও আশা করছে কিনা জানিনা, তবে এটা জানি যে মাঝে মাঝে ওর কলকাতা ছেড়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে ভালই লাগে। এইত সেদিন আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে গিয়ে বর্ধমানের রাস্তায় পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গম্বুজ আর হিন্দু মন্দিরের উপরে তৈরি ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান মসজিদ দেখে এলাম।

লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু দশদিনের ছুটিতে দেশে গেছেন বলে ফেলুদাকেই তাঁর জায়গা নিতে হল। পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলেন ত মশাই একটা দায়িত্ব আর একটা বাইনোকুলার আর দুখানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে, এদিকে গড়পারে ত কাক চড়ুই ছাড়া কোনো পাখি কোনদিন দেখিচি বলে মনে পড়েনা।'

বই দুটো হল সেলিম আলির ইণ্ডিয়ান বার্ডস আর অজয় হোমের বাংলার পাখি।

ফেলুদা বলল, 'কুছ পরোয়া নেহী। মনে রাখবেন কাক হল করভাস সপ্লেন্‌ডেন্‌স, চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস। সব সময় ল্যাটিন নাম বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাবে, তাই ইংরিজি নামও ব্যবহার করতে পারেন — যেমন ফিঙেকে ড্রঙ্গো, টুনটুনিকে টেলর বার্ড, ছাতারেকে জাঙ্গল ব্যবলার। আর পখি না দেখলেও, মাঝে মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে।'

'আমার নামও ত একটা চাই', বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনি হলেন ভবতোষ সিংহ, আপনার ভাইপো প্রবীর আর আমি সোমেশ্বর রায়।'

পৌনে নটায় রওনা হয়ে আমরা দশটা বেজে পাঁচে পানিহাটিতে শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি অমরাবতীতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়ি দেখেই বন্দুকধারী গুর্খা দারোয়ান এসে বিকট ক্যাঁ-চ শব্দে লোহার গেট খুলে দিল।

ফেলুদা বলে, 'গল্পের শুরুতেই একগাদা বর্ণনা হড় হড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়; ওটা দিবি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।' তাই শুধু বলছি—বিশাল জমির ওপর লাল বাড়িটা পেল্লায়, থমথমে আর অনেকটা বিলিতি কাস্‌লের ধাঁচে তৈরি। বাড়ির দক্ষিণে ফুলবাগান, তার পরে গাছপালা রাখার কাঁচের ঘর, আর তারও পরে ফল বাগান। নুড়ি বিছানো প্যাঁচালো পথ দিয়ে আমরা সদর দরজায় পৌঁছলাম।

বাড়ির মালিক গাড়ির শব্দ পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা নামলে হেসে বললেন, 'ওয়েলকাম্ টু অমরাবতী!' এঁর বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, ফরসা রং, বয়স পঞ্চাস টঞ্চাস। পরণে পায়জামা আর আদ্ধির পাঞ্জাবী, পায়ে শুঁড় তোলা লাল চটি, ডান হাতে চুরুট।



'আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে, তাকেও দলে টেনে নিয়েছি। অর্থাৎ সে আপনাদের আসল পরিচয় জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না।'

'অন্যরা কি এসে গেছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না। তাঁরা আসবেন বিকেলে। চলুন, একটু বসে জিরোবেন। আর সেই সুযোগে কিছু কথাও হবে।'

আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকের বিরাট চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। অমরাবতীর প্রাইভেট ঘাটও দেখতে পাচ্ছি সামনে-ডান দিকে। একটা তোরণের নিচ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জল অবধি।

'ওই ঘাট কি ব্যবহার হয়?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হয় বৈকি', বললেন শঙ্করবাবু। 'আমার খুড়ীমা থাকেন ত এখানে। উনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেন।'

'উনি একা থকেন এ বাড়িতে?'

'একা কেন? আমিও ত দু বছর হল এখানেই থাকি। টিটাগড় আমার কাজের জায়গা। কলকাতায় অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হয়।

'আপনার খুড়ীমার বয়স কত?'

'সেভেনটি এইট। আমাদের পুরোন চাকর অনন্ত ওঁর দেখাশোনা করে।

এমনিতে মোটামুটি শক্তই আছেন, তবে ছানি কাটাতে হয়েছে কিছুদিন হল, দাঁতও বেশি বাকি নেই, আর মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, খেতে ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছাঁচতে বসেন—এই আর কি। ঘুমত এমনিতে খুবই কম—রাত্তিরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাবার পর উনি আর কলকাতায় থাকতে চান নি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর মিষ্টি নিয়ে এল।

'দুপুরে খেতে খেতে সেই একটা-দেড়টা হবে,' বললেন শঙ্করবাবু 'কাজেই আপনারা মিষ্টিটার সদ্ব্যবহার করুন। এ মিষ্টি কলকাতায় পাবেন না।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আমাদের আসল আর নকল দুটো পরিচয়ই ত জানেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভালো হত। আপনি কী করেন জিগ্যেস করাটা কি অভদ্রতা হবে?'

মোটেই না,' বললেন শঙ্করবাবু। 'আপনাকে ডেকেছি ত সব কথা খুলে বলার জন্যেই; নাহলে আপনি কাজ করবেন কি করে?—সোজা কথায় আমি হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন, এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালোই চলে।'

'আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?

না। এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ -- বনোয়ারিলাল চৌধুরী।'

'অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি আমি?'

'এগজ্যাক্টলি। তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন, এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন। উনি এখানেই থাকতেন, এখানেই মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার আমার প্রপিতামহের মতো ছিলনা। তার দুটো কারণ— জুয়া আর মদ। তার ফলে চৌধুরী পরিবারের অবস্থা কিছুটা পড়ে যায়। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল---সেগুলোর কথায় পরে আসছি—তার কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিক্রী করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা, আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।'

'আর আপনার খুড়তুতো ভাই?'

'জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে এক এনজিনিয়ারিং ফার্মে। ভালোই রোজগার করে, তবে ইদানিং শুনছি ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদাদার একটা গুণ পেয়েছে আর কি? জয়ন্ত আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

এই ফাঁকে ফেলুদা পকেট থেকে তার মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে চালু করে দিয়েছে। এটা হংকং থেকে আনা। আজকাল মক্কেলের কথা খাতায় না লিখে রেকর্ডারে তুলে নেয়, তাতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

শঙ্করবাবু বললেন, 'আত্মীয়ের কথা ত হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই,' বলল ফেলুদা। 'যদিও প্রায় ঘসে উঠে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে আপনার কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে—'

'তার মানে আর কিছুই না, আজ হল আমার জন্মতিথি। ফোঁটাটা দিয়েছেন খুড়ীমা।'

'জন্মতিথি বলেই কি আজ এখানে অতিথি সমাগম হবে?'

'অতিথি বলতে মাত্র তিনজন। গত বছর ছিল ফিফ্‌টিয়েথ বার্থডে, সেবারও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম ওই একটি বারই তিথি পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কাবণে এবারও কবছি। বুঝতেই পারছেন, এবাড়িতে যাঁরা একবার এসেছেন, তাঁদের দ্বিতীয়বাব আসতে কোনো আপত্তি হবে না।'

'এ দ্বিতীয়বারেব কারণটা কী?'

শঙ্করবাবু একুট ভেবে বললেন, 'খুব ভালো হয় আপনারা যদি চা খেয়ে একবারটি দোতলায় আসেন আমার সঙ্গে—আমার খুড়িমার ঘরে। তাহলে বাকী ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে। আর আমিও ব্যাপাবটা গুছিয়ে বলতে পারব।'

আমরা মিনিটখানেকর মধ্যেই উঠে পড়লাম।

সিঁড়িতে পৌঁছাতে হলে বৈঠকখানা দিয়ে যেতে হয় এখানে বলে রাখি — বাহারের আসবাব, কার্পেট, মখমলে পর্দা, ঝাড়লণ্ঠন, শ্বেতপাথরের মূর্তি ইত্যাদি মিলিয়ে এমন জমজমাট বৈঠকখানা আমি বেশি দেখিনি।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে ফেলুদা বলল, 'আপনার খুড়ীমা ছাড়া দোতলায় আর কে থাকেন?'

'খুড়ীমা থাকেন উত্তর প্রান্তে,' বললেন শঙ্করবাবু, 'আর দক্ষিণে থাকি আমি। জয়ন্ত এলেও দক্ষিণেরই একটা ঘরে থাকে।'

দোতলার ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম খুড়ীমার ঘরে। বেশ বড় ঘর, কিন্তু এতে কোনো জাঁকজমক নেই পশ্চিমে দরজার বাইরে আলো আর বাতাসের বহর দেখে বোঝা যায় ওদিকেই গঙ্গা। দরজার পাশেই বুড়ি মাদুরে বসে মালা জপছেন। তাঁর পাশে একটা হামানদিস্তা, একটা পানের বাটা আর

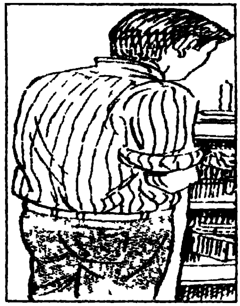
একটা মোটা বই। নির্ঘাৎ রামায়ণ মহাভারত হবে। আসবাব বলতে একটা খাট আর একটা ছোট আলমারি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই খুড়ীমা মাথা তুলে পুরু চশমা ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কজন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে,' বললে শঙ্করবাবু।

'তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?'

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধা বললেন, 'তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে নাম ত মনে থাকবেনা। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে মাঝে। এখন ত বসে বসে দিন গোনা।'



'আসুন—'

শঙ্করবাবুর ডাকে আমরা ঘুরলাম। বৃদ্ধা আবার বিড়বিড় করে মালা জপতে শুরু করলেন।

এবার দেখলাম ঘরের উল্টোদিকে খাটের পাশে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক রয়েছে। শঙ্করবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললেন, 'এবারে আপনাদের যে জিনিস দেখাব সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন। এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে। যেমন এই যে দেখুন—'

শঙ্করবাবু একটা থলি বার করে তার মুখটা ফাঁক করে হাতের তেলোয় উপুড় করলেন। ঝন ঝন করে কিচ্ছু গোল চাকতি তেলোয় পড়ল।

'জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা,' বললেন শঙ্করবাবু। 'দেখুন, প্রত্যেকটিতে একটি করে রাশির ছবি খোদাই করা। এ জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।'

'রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'বারো হওয়া উচিত নয় কি?'

'একটি মিসিং।'

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম।

'আরো জিনিস আছে,' বললেন শঙ্করবাবু, 'সেগুলো এই আইভরির বাক্সটার মধ্যে। সোনার উপর চুনি বসানো ইটালিয়ান নস্যির কৌটো, জেড পাথরে চুনি আর পান্না বসানো মোগল সুরাপাত্র, আংটি, লকেট ..কিন্তু সে সব আপনারা দেখবেন আজ সন্ধ্যাবেলা, সর্বসমক্ষে। এখন নয়।'

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

'এর চাবি ত আপনার কাছেই থাকে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপলিকেট আছে, থাকে খুড়ীমার আলমারিতে।'

'কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?'

'এ ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের ঘর। সিন্দুক তাঁরই আমলের। ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা আছে গেটে, এ ঘরে খুড়ীমা প্রায় সর্বক্ষণ থাকেন, তাই এক হিসেবে ওটা এখানে যথেষ্ট সেফ।'



আমরা আবার নিজের বারান্দায় ফিরে এলাম। চেয়ারে বসার পর ফেলুদা টেপরেকর্ডার চালু করে দিয়ে বলল, 'একটি মুদ্রা মিসিং হল কি করে?'

'সে কথাই ত বলছি, বললেন শঙ্করবাবু। 'তিনজনকে উইক এণ্ডে নেমন্তন্ন করেছিলাম গত জন্মতিথিতে। একজন হলেন আমার বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল। আরেকজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আরা তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালিনাথ রায়। ইনি ইস্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন; পঁয়ত্রিশ বছর পরে আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার প্রপিতামহের মহামূল্য সম্পত্তির কথা এঁরা সকলেই শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বার করে নিচে বৈঠকখানায় আনে। কয়েনগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রেখেছি, সকলে ঘিরে দেখছে, এমন সময় হল লোডশেডিং। ঘর অন্ধকার। এটা অবিশ্যি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। চাকর দুমিনিটের মধ্যে মোমবাতি নিয়ে আসল, আমি কয়েনগুলো তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রেখে এলাম। একটা যে কমে গেছে সেটা তখন খেয়াল করিনি। এমন যে হতে পারে কল্পনাও করিনি। পরদিন সকলে চলে যাবার পর মনে একটা খটকা লাগাতে সিন্দুক খুলে দেখি কর্কটরাশির মুদ্রাটি নেই।'

'কয়েনগুলো আপনিই তুলে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি। ব্যাপারটা বুঝুন মিঃ মিত্তির। তিনজন নিমন্ত্রিত। একজনকে পঁচিশ বছর চিনি—আমার বিজনেস পার্টনার। অর্ধেন্দু সরকার হলেন ডাক্তার এবং ভালোই ডাক্তার। খড়দা টিটাগড় থেকে কল আসে ওঁর। আর কালিনাথ আমার বাল্যবন্ধু।'

'কিন্তু এঁদের সকলকেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?'

'সেখানেই অবিশ্যি গণ্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন। ব্যবসায় অনেকেই জেনেশুনে অসৎ পন্থা নেয়, কিন্তু কাঞ্জিলালের মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাকে ঠাট্টা করে বলে—তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও, তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।'

'আর অন্য দুজন?'

'ডাক্তারের কথা অমি জানিনা। খুড়ীমা মাঝে মাঝে বাতে ভোগেন, ডাক্তার তাঁকে এসে দেখে যান। এর বেশি জানিনা। তবে কালিনাথ বোধহয় গভীর জলের মাছ। এক যুগ দেখা নেই। হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে আমার কাছে এল। বলল—বয়স যত বাড়ছে ততই পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে। তাই একবার ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।'

'আপনি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন?'

'তা চিনেছিলাম। তাছাড়া ইস্কুলের বহু পুরোন গল্প করে। সে যে আমার সহপাঠী তাতে সন্দেহ নেই। গোলমালটা হচ্ছে, সে যে এখন কী করে তা কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিজ্ঞ্যেস করলেই বলে, ধরে নাও তোমারই মতো ব্যবসা করি। এদিকে গুণ যে নেই তা নয়। খুব আমুদে রসিক লোক। ইস্কুলে থাকতে ম্যাজিক দেখাত, এখনো সে অভ্যাসটা রেখেছে। হাত সাফাই রীতিমতো ভালো।'

'আপনার ভাইও ত অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ছিলেন।'

'সে ছিল। তবে সে ত এ জিনিস আগে দেখেছে, তাই সে টেবিলের কাছে ছিল না। নিয়ে থাকলে ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।'

'তারপর আপনি কী করলেন?

'কী আর করতে পারি বলুন। এমন লোক আছে যারা এই অবস্থায় সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাতো। কিন্তু আমি পারিনি। ওই তিনজনের সঙ্গে বসে কত ব্রিজ খেলেছি, আর তাদের একজনকে বলব চোর?'

'তার মানে স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?'

'স্রেফ হজম করে গেলাম। ফলে এখনো কেউ জানেইনা যে আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছি। সেই ঘটনার পরেও ত এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কতবার, কিন্তু কেউ ত কোনোরকম অশোয়াস্তি বা অপরাধ বোধ করছে বলে মনে হয়নি। অথচ আমি জানি যে এই তিনজনের মধ্যেই একজন দোষী। একজন চোর।'

আমরা তিনজনেই চুপ। ঘটনাটা অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?

আমার মনের প্রশ্নটা ফেলুদাই করল। শঙ্করবাবু বললেন, 'এরা জানে যে আমি এদের সন্দেহ করি না। তাই এদের আবার ডেকেছি, এবং আজ রাত্রে আমি আবার এদের সামনে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান জিনিস বার করব। মাসখানেক থেকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায় লোডশেডিং হচ্ছে এখানে। তার ঠিক আগে আমি জিনিসগুলো টেবিলে সাজাব। ঘর আবার অন্ধকার হবে। আশা করছি সেই অন্ধকারে চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এই সম্পত্তির মূল্য চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখের কম নয়। হয়ত আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস চোর লোভ সামলাতে পারবে না। চুরির পর আপনি আপনার আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তখন প্রদোষ মিত্তিরের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বার করা।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?'

'সেওত কাল অবধি কিছুই জানতনা,' বললেন শঙ্করবাবু, 'কাল আপনাকে ইনভাইট করার পর ওকে বলি।'

'উনি কী বললেন?'

'খুব চোটপাট করল। বলল—তুমি অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছ ব্যাপারটা—তখন-তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মিঃ মিত্তির কিছু করতে পারবেন, ইত্যাদি।'

'একটা কথা বলব মিঃ চৌধুরী?'

'বলুন।'

'আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগ নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পেছপা হত না।'

'সেটা জানি। সেই জন্যই ত আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, সেটা আপনি পারবেন।'

২

সর্ষে বাটা দিয়ে চমৎকার গঙ্গার ইলিশ সমেত দুপুরের খাওয়াটা হল ফার্স্ট ক্লাস। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হল খাবার টেবিলেই। ইনি মাঝারি হাইটের চেয়েও কম, বেশ সুস্থ, সবল মানুষ। শঙ্করবাবুর পার্সোনালিটি এঁর নেই, কিন্তু বেশ হাসিখুশি চালাক চতুর লোক।

খাবার পর শঙ্করবাবু বললেন, 'আপনাদের এখন আর ডিস্টার্ব করবনা, যা মন চায় করুন। আমি একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলে চায়ের সময় বারান্দায় আবার দেখা হবে।'

আমরা জয়ন্তবাবুর সঙ্গে বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখব বলে বেরোলাম।

পশ্চিম দিকে একটানা একটা নিচু থামওয়ালা পাঁচিল চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে। পাঁচিলের পরেই জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল অবধি। এই পাঁচিলই বাকি তিনদিকে হয়ে গেছে দেড় মানুষ উঁচু। জয়ন্তবাবুর ফুলের শখ, তাই তিনি আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে গোলাপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। গোলাপ যে তিনশো রকমের হয় তা এই প্রথম জানলাম।

বাড়ির উত্তরে গিয়ে দেখলাম সেদিকে আরেকটা গেট রয়েছে। শহরে কোথাও যেতে গেলে এই গেটটাই নাকি ব্যবহার করা হয়।

আরেকটা সিঁড়িও রয়েছে এদিকে জয়ন্তবাবু বললেন খুড়ীমা, মানে ওর মা, গঙ্গাস্নানে যেতে ওটাই ব্যবহার করেন। এক তলায় নদীর দিকে আর গঙ্গার দিকে চওড়া বারান্দা, দুদিক দিয়েই সিঁড়ি রয়েছে নিচে নামার জন্য।



দেখা শেষ হলে পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। জয়ন্তবাবু কাঁচের ঘরে চলে গেলেন অর্কিড় দেখার জন্য।

আমাদের থাকার জন্য একতলায় একটা প্যাসেজের এক দিকে পর পর দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে আরো তিনটে পাশাপাশি ঘর দেখে মনে হল তাতেই বোধহয় তিনজন অতিথি থাকবেন। ঘরে ঢুকে বাহারে খাটে নরম বিছানা দেখে লালমোহনবাবু বোধহয় দিবানিদ্রার তাল করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'পাখির বইগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

আমি একটা কথা ফেলুদাকে না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তাহলে তুমি চোর ধরবে কি করে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা এই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলা শক্ত। যার মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি রয়েছে, তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেস্ট লোকের একটা সূক্ষ্ম তফাৎ থাকা উচিত। চোখ-কান খোলা রাখলে সে তফাৎ ধরা পড়তে পারে। ভুলিসনা, যে লোক চুরি করে তার বাইরেটা যতই পালিশ

করা হোক না কেন তাকে আর ভদ্রলোক বলা চলে না। সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিনয় করতে হয়।'

বিকেলে পর পর দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম অতিথিরা এসে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আয়োজন হলে পর শঙ্করবাবুই আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তিন গেস্টের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে।

ডাঃ সরকার এক মাইলের মধ্যেই থাকেন, ইনি হেঁটেই এসেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, গোঁফটা কাঁচা হলেও, কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে।

নরেশ কাঞ্জিলাল বিরাট মানুষ, ইনি সুট-টাই পরে সাহেব সেজে এসেছেন। ফেলুদার পরিচয় জেনে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শঙ্করকে অনেকবার বলেছি। আপনি এ কাজের ভারটা নিয়েছেন শুনে খুশি হলাম। হি ওয়জ এ রিমার্কেবল ম্যান।'

মজার লোক হলেন কালিনাথ রায়। এঁর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, তাতে হয়ত ম্যাজিকের সরঞ্জাম থাকতে পারে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতেই বললেন, 'পক্ষিবিদ্ যে মুরগীর ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে তা তো জানতুম না মশাই।' কথাটা বলেই খপ্ করে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুরগীর ডিমের সাইজের মসৃণ সাদা পাথর বার করে দিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এ হে হে, এ যে দেখছি পাথর! আমি ত ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলুম।'

কথা হল রাত্তিরে খাবার পর কালিনাথবাবু তার হাতসাফাই দেখাবেন।

সূর্য হেলে পড়েছে, গঙ্গার জল চিক্ চিক্ করছে, ঝিরঝিরে হাওয়া, তাই বোধহয় নরেশবাবু আর কালিনাথবাবু নেমে গেলেন বাইরের শোভা উপভোগ করতে। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্ করছিলেন, এবার বাইনোকুলার বার করে উঠে পড়ে বললেন, 'দুপুরে যেন একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের ডাক শুনছিলুম। দেখিত পাখিটা আশে পাশে আছে কিনা।'

ফেলুদার গম্ভীর মুখ দেখে আমিও হাসিটা কোনোমতে চেপে গেলাম।

ডাক্তার সরকার চায়ে চুমুক দিয়ে শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে বল্‌লেন, 'আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছিনা—সে কি বাগানে ঘুরছে নাকি?'

'ওর ফুলের নেশার কথা ত আপনি জানেন।'

'ওঁকে ত বলেছি মাথায় টুপি না পরে যেন রোদে না ঘোরেন। সে আদেশ তিনি মেনেছেন কি?'

'জয়ন্ত কি ডাক্তারের আদেশ মানার লোক? আপনি তাকে চেনেন না?'

ফেলুদা যে চারমিনারের হাতে আড়চোখে ডাক্তারের কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

'আপনার খুড়ীমা কেমন আছেন?' শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন ডাঃ সরকার।

'এমনিতে ত ভালোই,' বললেন শঙ্করবাবু, 'তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। আপনি একবার টুঁ মেরে আসুন না।'

'তাই যাই।'

ডাঃ সরকার চলে গেলেন খুড়ীমাকে দেখতে। প্রায় একই সঙ্গে জয়ন্তবাবু ফিরে এলেন বাগান থেকে—ঠোঁটের কোণে হাসি।

'কী ব্যাপার? হাসির কি হল?' জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু টি পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বন্ধু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন পক্ষিবিদের।'

ফেলুদাও হেসে বলল, 'অভিনয় ত আজ সকলকেই করতে হবে অল্পবিস্তর। আপনার দাদার পরিকল্পনাটাইত নাটকীয়।'

জয়ন্তবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাপ্রুভ করেন?'

'আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে?' বলল ফেলুদা।

'মোটেই না,' বললেন জয়ন্তবাবু। আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবেনা যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানেনা যে দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছেন যে সিন্দুকের একটি মূল্যবান জিনিস গায়েব হয়ে গেছে?'

'সবই বুঝি,' বললেন শঙ্করবাবু,'কিন্তু তাও আমি ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও এটা আমার গোয়েন্দা কাহিনী-প্রীতির ফল।'

'তুমি কি সিন্দুকের বাকি সব জিনিসই বার করতে চাও?'

'না। শুধু ইটালিয়ান নস্যির কৌটো আর মোগলাই সুরাপাত্র। ডাঃ সরকাব খুড়ীমাকে দেখতে গেছেন। উনি এলেই তুমি ওপরে গিয়ে জিনিসদুটো বার করে আনবে। আমি পকেটে রেখে দেবে। এই নাও চাবি।'

জয়ন্তবাবু অনিচ্ছার ভাব করে চাবিটা নিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডাঃ সরকার ফিরে এলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দিব্যি ভালো আছেন আপনার খুড়ীমা। বারান্দায় বসে দুধভাত খাচ্ছেন। বললেন আপনাদের আরো অনেকদিন জ্বালাবেন।'

জয়ন্তবাবু চুপচাপ উঠে পড়লেন।

'কী বসে আছেন চেয়ারে?' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ডাঃ সরকার। 'চলুন একটু হাওয়া খাবেন। এ হাওয়া কলকাতায় পাবেন না।'

শঙ্করবাবু সমেত আমরা চারজনই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বাঁয়ে চেয়ে দেখি লালমোহনবাবু বাগানের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। 'পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'না, তবে এইমাত্র একটা জাঙ্গল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।'

'এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়,' বলল ফেলুদা। 'এর পরে প্যাঁচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।'

বাকি দুজনে গেলেন কোথায়? বাড়ির সামনের দিকে কি, না কাঁচের ঘরের পিছনে ফলবাগানে?

শঙ্করবাবুর বোধহয় একই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, কারণ উনি হাঁক দিয়ে উঠলেন—'কই হে, নরেশ? কালিনাথ গেলে কোথায়?'

'একজনকে দেখলুম এদিকের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'কোনজন?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'বোধহয় সেই ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক।'

কিন্তু লালমোহনবাবু ভুল দেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কালিনাথবাবু নয়, নরেশ কাঞ্জিলাল।

'সন্ধের দিকে ঝপ করে টেমপারেচারটা পড়ে,' বললেন কাঞ্জিলাল, 'তাই আলোয়ানটা চাপিয়ে এলাম।'

'আর কালিনাথ'? প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'সে তো বাগানে নেমেই আলাদা হয়ে গেল। বলছিল শুকনো ফুলকে টাটকা করে দেবার একটা ম্যাজিক দেখাবে, তাই—'

মিঃ কাঞ্জিলালের কথা আর শেষ হল না, কারণ সেই সময় বুড়ো চাকর অনন্তর চিৎকার শোনা গেল।

'দাদাবাবু!'

অনন্ত গঙ্গার দিকের বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটে এল আমাদের দিকে।

'কী হল অনন্ত?' শংকরবাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে এগিয়ে গেলেন।

'ছোট দাদাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দোতলায়।'

৩

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যাণ্ডিং পেরিয়েই খুড়ীমার ঘর, সেটা আগেই বলেছি। জয়ন্তবাবু সেই ঘরের চৌকাঠের হাত তিনেক এদিকে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর মাথার পিছনের মেঝেতে খানিকটা রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে।

ডাক্তার সরকার দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবচেয়ে আগে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর নাড়ী টিপে ধরলেন। ফেলুদাও প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার মুখ গম্ভীর, কপালে খাঁজ।

'কী মনে হচ্ছে?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'পাল্‌স সামান্য দ্রুত,' বললেন ডাঃ সরকার।

'মাথার জখমটা?'

'মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে। এই সময় খালি মাথায় রোদে ঘোরা ডেনজারাস সেটা অনেকবার বলেছি ওঁকে।'



'কনকাশন—?'

'সেটাত পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব না। আজ আবার আমি যন্ত্রপাতি কিছুই আনিনি সঙ্গে। একবাব হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত।'

'তাই করুন না। গাড়িত রয়েছে।'

ভদ্রলোক বেশ ভালো ভাবেই অজ্ঞান হয়েছেন, কারণ ফেলুদা সমেত চারজনে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলাব সময়ও তাঁব জ্ঞান হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অবিশ্যি কালিনাথবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। বললেন, 'আমি জাস্ট ওষুধটা খাবার জন্য ঘরে গেছি—আর তার মধ্যে এই কাণ্ড।'

'আমি সঙ্গে আসব কি?' শঙ্কববাবু ডাক্তারকে জিগোস করলেন।

'কোনো দরকার নেই,' বললেন ডাঃ সরকার, 'আমি হাসপাতাল থেকে আপনাকে ফোন করব।'

গাড়ি চলে গেল। এই দুর্ঘটনার জন্য শঙ্করবাবুর প্ল্যান যে ভেস্তে গেল সেটা বুঝতে পারছি। বেচারী ভদ্রলোকের জন্মতিথিতে এমন একটা ঘটনা ঘটার জন্য আমারও খারাপ লাগছিল।

আমরা সবাই এসে বসবার ঘরে বসেছিলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা কেন যে 'আমি আসছি' বলে উঠে গেল তা জানিনা। অবিশ্যি মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার ফিরে এল।

শঙ্করবাবু অতিথিদের সামনে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি ব্যবহার করছিলেন। এমন কি তাঁর আশ্চর্য প্রপিতামহ সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ঘটনাও বলছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেটা করতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক এইভাবে চলার পর হাসপাতাল থেকে ডাঃ সবকারের ফোন এল। জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়েছে। তিনি অনেকটা ভালো। মনে হচ্ছে কাল সকালেই ফিরে আসতে পারবেন।

এই সুখবরের পর অবিশ্যি ঘরের আবহাওয়া খানিকটা হালকা হল, কিন্তু আমি জানি যে শঙ্করবাবুর মোটেই ভালো লাগছে না, কারণ চোরের রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর, ভিডিও-ক্যাসেটে ছবি দেখতে চাই কিনা জিগ্যেস করাতে আমরা সকলেই না বললাম। এ অবস্থায় ফূর্তি চলেনা। তাই ম্যাজিকও বাদ পড়ল।

সকলকে গুড নাইট জানিয়ে নিজেদের ঘরে আসতেই আমি যে প্রশ্নটা ফেলুদাকে করব ভাবছিলাম, সেটা লালমোহনবাবু করে ফেললেন।

'আপনি তখন ফস্ কবে বেরিয়ে কোথায় গেলেন মশাই?'

'খুড়ীমার ঘরে।'

'খুড়ীমাকে দেখতে গেসলেন?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন কবলেন লালমোহনবাবু।

'সেই সঙ্গে অবিশ্যি সিন্দুকের হাতল ধরে একটা টানও দিয়ে এলাম।'

'খোলা নাকি?'

'বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যে ভাবে ঘরের দরজাব দিকে পা করে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তাতে মনে হয় ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।'

'কিন্তু চাবিটা কোথায়, ফেলুদা?' আমি জিগ্যেস করলাম। প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল।

ফেলুদা বলল, 'শঙ্করবাবু হয়ত দুর্ঘটনায় ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।'

কথাটা বলতে বলতেই শঙ্করবাবু এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। 'দেখুন ত কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল!' বললেন ভদ্রলোক। 'জয়ন্তব আরেকবার এরকম হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেসারটা একটু বেশি নেমে যায় মাঝে মাঝে।'

'ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?'

'সেটাই ত বলতে এলাম। তখন লোকজনের সামনে বলিনি। চাবির কথাটা

ত গোলমালে ভুলেই গিয়েছিলাম; এখন কী হয়েছে জানেন ত? ডাক্তারকে জিগ্যেস করতে বললেন জয়ন্তর কাছে চাবি ছিলনা। হয়ত অজ্ঞান হবার সময় হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'আপনি খুঁজেছেন চাবি?'

'তন্ন তন্ন করে। সিঁড়ি, ল্যাণ্ডিং, সদর দরজার বাইরে, কোথাও বাদ দিইনি। সে চাবি হাওয়া।'

'থাক্‌গে, ডুপলিকেট আছে ত,' বলল ফেলুদা। 'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'তা না হয় ভাবব না,' গম্ভীরভাবে বললেন শঙ্করবাবু, 'কিন্তু রহস্য ত দূর হলনা। চোর ত অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। আর আপনাকে একটা মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম, সেটাও হলনা।'

'তাতে কী হল?' ফেলুদা বলল। 'এখানে এসে লাভ হয়েছে বিস্তর। একে এরকম বাড়ি, তার উপর আপনার আতিথেয়তা।'

শংকরবাবু যাবার আগে বলে গেলেন যে সকালে সাড়ে ছটায় চা দেব, আর আটটায় ব্রেকফাস্ট।

'এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়ত মশাই?' লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলেন। 'মিঃ কাঞ্জিলাল আর মিঃ ম্যাজিশিয়ান দুজনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন।'

'মার্ডারের দরকার কী? কার্যসিদ্ধির জন্য ত শুধু অজ্ঞান করলেই চলে।'

'কার্যসিদ্ধি?'

'জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বার করার বার করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।'

সর্বনাশ! এটাত খেয়াল হয়নি আমার! আমি বললাম 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ত এখন তিনজনের জায়গায় সাসপেক্ট মাত্র দুজন—কাঞ্জিলাল আর কালিনাথ।'

'নারে তোপ্‌সে,' বলল ফেলুদা 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জয়ন্তবাবুর মাথায় কেউ বাড়ি মারলে ত সেটা তিনি জ্ঞান হলে বলতেন; তাতো বলেননি। আর অজ্ঞান করে যে সিন্দুক খুলবে সেটাই বা কি করে সম্ভব—খুড়ীমা ত ঘরে থাকতে পারেন। একজন বাইরের লোক সিন্দুক খুলছে দেখলে কি তিনি চুপ করে থাকতেন?'

একটা আশার আলো জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেল। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আর ঘুমোন হল না। ফেলুদা এমনিতেও পায়চারি করছিল, বারোটা নাগাদ লালমোহনবাবু হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে

নিচু গলায় বললেন, 'বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই— উপ্‌চে পড়ে আলো!'

'উপ্‌চে নয়, উছ্‌লে,' বলল ফেলুদা।

'সরি, উছ্‌লে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না কখনো।'

'আপনি একা কাব্যি করবেন, এটা হতে দেওয়া যায় না,' বলল ফেলুদা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে গিয়ে মনে হল এ যেন দিনের বেলার দৃশ্যর চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর। একটা পাতলা কুয়াশা নদীর ওপারটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবছা গাঢ় জলের উপর ছড়ানো চাঁদির টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। তারই মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, হাসনাহানার গন্ধ। ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী।

ফেলুদা ত্রয়োদশীর চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কেউ কোনো দিন নষ্ট করতে পারবে না।'

'একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনার এথিনিয়াম ইন্‌স্টিটিউশনের সেই বাংলার শিক্ষকের লেখা?'

'ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে লোকটা রেকগনিশন পেলেনা, কিন্তু আমি বলছি, আপনি শুনুন কবিতাটা। শোনো, তপেশ।'

এতক্ষণ আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু আবৃত্তির সময় লালমোহনবাবুর গলা আপনা থেকেই চড়ে গেল।

'আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে—
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অমাবস্যা—
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রম্‌পশ্যা!

বুঝতেই পারছ, তপেশ, পদ্যটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।'

'একজন লেডিকে ত আপনি আবৃত্তির ঠেলায় ঘর থেকে টেনে বার করেছেন দেখছি।'

ফেলুদার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। ওই যে খুড়ীমার ঘর। বৃদ্ধা বারান্দার দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এর পরে আমরা ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলাম আধ ঘণ্টা। মনমেজাজ তাজা, রাতের খাওয়া হজম। তারপব এক সময় ফেলুদা তার হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল চোখেব সামনে ধরে বলল, 'পৌনে এক।'



আমরা তিনজনেই উঠে পড়লাম, আব তিনজনেই একসঙ্গে শুনলাম শব্দটা।

সেটা যেন আসছে বাড়ির দোতলা থেকেই।

খট্ খট্ ঠং খট্ ঠং খট্ খট্‌·····

আমবা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

'সিঁদ কাটছে নাকি মশাই?' লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ কবে জিগ্যেস কবলেন।

আমাদেব দৃষ্টি আবাব চলে গেছে খুড়ীমাব ঘবেব দিকে। ঘবে একটা টিমটিম আলো জ্বলছে। আওযাজটা আসছে ওই ঘব থেকেই।

খট্ খট্ খট্ খট্ ঠং ঠং ····

কিন্তু ওই ঘর ছাড়াও আবেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘবটা। খেলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজন লোক দাঁড়িযে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এবার লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'মিঃ কাঞ্জিলাল,' বলল ফেলুদা। 'ওটাই শঙ্কববাবুব ঘব।'

'এই মাঝবাত্তিবে কী আলোচনা মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন কবলেন।

'জানিনা,' বলল ফেলুদা। 'ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।'

'আপনাদেরও ঘুম আসছেনা?'

নতুন গলা পেয়ে চমকে উঠে দেখি ম্যাজিশিয়ান কালিনাথবাবু।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। খট্ খট্ শব্দটা এখনো হয়ে চলেছে। কালিনাথবাবুব ঘাড় ঘুরে গেল সেই দিকে।

'কিসের শব্দ বুঝতে পারছেন ত?' প্রশ্ন কবলেন ভদ্রলোক।

'হামানদিস্তা কি?' ফেলুদা বলল।

'ঠিক বলেছেন। এই মাঝরাত্তিরে বুড়ি পান ছাঁচতে বসেন। এ শব্দ আগেও পেয়েছি।'

কথাটা বলে হাতের তেলোর আড়ালে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে একটা সেয়ানা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হল কেন?'

আমি ত থ'! লালমোহনবাবুরও মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা একটু হালকা হেসে বলল, 'যাক্, অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালোই লাগল!'



'তা জানবেনা কেন মিঃ মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। অনেক কিছু দেখে শুনে চোখ কান দুইই খুলে গেছে।'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?'

'খুলে আর কজনে বলতে পারে মিঃ মিত্তির? স্পষ্ট বক্তা আর কজনে হয়? বেশির ভাগই ত মুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি। আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার। তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। এখানে এসে আপনার পেশাটাকে কাজে লাগানোর কথা ভুলে যান। অমরাবতীতে এসেছেন, দুদিন ফুর্তি করে গঙ্গার হওয়া খেয়ে ফিরে যান। নইলে বিপদে পড়তে পারেন।'

'আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

কালিনাথবাবু নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

'লোকটা অনেক কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে? চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'একটা জিনিস ত জানতেই পারে,' বলল ফেলুদা।

'কী?' আমরা দুজনে একসঙ্গে জিগ্যেস করলাম।

'চুরিটা কে করেছিল। যে করেছিল সে তো ওঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সেটা ত উনি নিজেও করে থাকতে পারেন। উনি ত হাত সাফাই জানেন।'

৪

সাড়ে ছটায় বেড টি না দিলে হয়ত ঘুম ভাঙতে আরো দেরি হত, কিন্তু ফেলুদাকে দেখে মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে। জিগ্যেস করাতে বলল, 'শুধু উঠেছি নয়, এর মধ্যে একটা চক্করও মেরে এসেছি।'

'কোথায়?'

'শহরের দিকে।'

'কী দেখলে?'

'কী দেখলাম না সেটাই বড় কথা।'

'কিছু বুঝতে পারলে?'

'পানিহাটিতে আসা বৃথা হয়নি এটা বুঝেছি।'

লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'এমন সলিড ঘুম নাকি ওঁর অনেকদিন হয়নি।

'খুড়ীমার উঠতে দেরি দেখে তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে,' বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'সেটা আবার কি করে জানলে?'

'অনন্তকে জিগ্যেস করেছিলাম। সে বলল মা-ঠাকরণ এখনো গঙ্গাস্নানে যান নি। এমনিতে ছটার মধ্যে নাকি ওঁর স্নান সারা হয়ে যায়।'

আমরা তিনজন বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যে শঙ্করবাবু এসে পড়লেন। স্নান-টান সেরে ফিটফাট।

'আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, মিঃ চৌধুরী,' বলল ফেলুদা! 'আপনার বাল্যবন্ধু আমায় চিনে ফিলেছেন।'

'সে কি!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ।'

'তাহলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?'

'তাহলে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার জানিয়ে দিতে হবে আপনি কেন আমাকে ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।'

শঙ্করবাবুর কপালে আবার দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাঞ্জিলাল আর কালিনাথবাবু বারান্দায় এসে পড়লেন, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঞ্জিলাল আর কালিনাথ বারান্দায় রয়ে গেলেন, আমরা চারজন সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলাম।

লাল ক্রস-মারা একটা কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে নামলেন জয়ন্তবাবু আর ডঃ সরকার। জয়ন্তবাবুর মাথার পিছনের চুল খানিকটা কামিয়ে সেখানে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে।

জয়ন্তবাবু নেমেই তাঁর দাদার কাছে ক্ষমা চাইলেন।—'ভেরি সরি। তোমার জন্মতিথিতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে প্রেশারটা....'

'কোনো চিন্তা নেই,' বললেন ডঃ সরকার। 'আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। তবে রোদে বেশি ঘোরাঘুরি চলবে না।'

'আপনারা চা খাবেন ত?' বললেন শঙ্করবাবু।

'তা হলে মন্দ হতনা। চা-পানের সময় পাইনি এখনো।'

'এরা সব কোথায়?' জয়ন্তবাবু জিগ্যেস করলেন।

'বারান্দায়' বললেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু আর ডঃ সরকার বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

'চলুন সকলে এক সঙ্গেই বসা যাক,' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন শঙ্করবাবু।

'দাঁড়ান আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।'

ফেলুদা কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। কী কাজের কথা বলছে ও?

'কাজ?' শঙ্করবাবু একটু যেন অবাক হয়েই জিগ্যেস করলেন।

'আপনার খুড়ীমার কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

'তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু—'

'একবার সিন্দুকটা খুলে দেখতে চাই।'

খুড়ীমার ঘরে গিয়ে দেখি বুড়ি গামছা নিয়ে স্নানে বেরোচ্ছেন।

'আজ তোমার এত দেরি?' শঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি ঝাঁঝা রোদ। একেকদিন কী যে হয়!'

'তোমার চাবিগোছাটা একবার দিতে হবে খুড়ীমা। সিন্দুকটা খুলব?'

'কিন্তু তোর কাছে যে—?'

'আমারটা খুজে পাচ্ছিনা।'

খুড়ীমা আলমারি খুলে চাবির গোছা বার করে দিয়ে চলে গেলেন।

শঙ্করবাবু সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর সেই ফাঁকে কেন জানি ফেলুদা হামানদিস্তাটা হাতে নিয়ে একবার নেড়ে চেড়ে দেখল।

'সর্বনাশ!'

শঙ্করবাবুর চিৎকারে চমকে লালমোহনবাবু সেলিম আলির বইটা তাঁর হাত থেকে ফেলেই দিলেন।

'থলি বাক্স কিছুই নেই,' বলল ফেলুদা।

শঙ্করবাবুর ফ্যাকাশে মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছেনা।

'ওটা বন্ধ করুন,' বলল ফেলুদা। 'তারপর চলুন নিচে যাওয়া যাক। সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন, এবং কতকগুলো প্রশ্ন করব সেটাও জানিয়ে দিন।'

বুঝতে পারছি শঙ্করবাবুকে অনেকখানি মনের জোব প্রয়োগ কবতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি গত বছরের চুরির ব্যাপারটা, আর আজ এই মাত্র সিন্দুক খুলে যা দেখলেন সেটা মোটামুটি গুছিয়ে সকলকে বলে বললেন, 'আমার বাড়িতে আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা স্পপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে তাতে কোনো ভুল নেই, আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেসটিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

সকলে চুপ। কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখে বোঝাব উপায় নেই।

ফেলুদা সুরু করল। প্রথম প্রশ্নটা ডঃ সরকারকে, আব সেটা যাকে বলে অপ্রত্যাশিত।

'ডাঃ সরকার, আপনাদের এই পানিহাটিতে কটা হাসপাতাল আছে?'

'একটাই,' বললেন ডাঃ সরকার।

'তার মানে সেখানেই আপনি নিয়ে গিযেছিলেন জয়ন্তবাবুকে, আর সেখান থেকেই কাল বাত্রে ফোন করেছিলেন?

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি কি?'

'কারণ আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম,

জয়ন্তবাবু সেখানে যান নি।'

ডঃ সরকার হাসলেন।

'কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম সে কথা ত আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।'

'তবে কোত্থেকে করছিলেন?

'আমার বাড়ি থেকে। কাল যাবার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। তখন বুঝতে পারি আঘাত গুরুতর নয়, কনকাশন হয়নি। তবু একবার দেখব বলে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই। তখনই ঠিক করি রাত্তিরটা ওখানে বেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন,' বলল ফেলুদা। 'আপনি কাল যে সিন্দুক খোলার জন্য চাবিটা নিলেন, সেটাত আপনারই হাতেই ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ার পর আর হাতে নাও থাকতে পারে।'

'হাতে না থাকলেও, কাছাকাছিই পড়ে থাকার কথা। কিন্তু তা ত ছিলনা।'

'সেটার আমি কি জানি? চাবি আপনারা খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তার আমি কী করতে পারি? আপনি কী বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না।'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে, সেটাও ডাক্তারকে। তারপরেই সরাসরি বলছি। ডঃ সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।'

'কেন জানবনা?'

'সাধারণ লোকের চোখে সেটার রঙের সঙ্গে রক্তের কোনো তফাৎ ধরা পড়েনা সেটাও নিশ্চয়ই জানেন।'

ডাক্তার সরকার গলা খাক্‌রানি দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

'আমার বিশ্বাসটা কী তাহলে এবার বলি?' বলল ফেলুদা। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। 'আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হবার ভান করেছিলেন—ডাক্তার সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়া দরকার ছিল।'



'ননসেন্স!' চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'কেন, চলে যাব কেন?'

'কারণ মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে।'

'ফিরে আসব?'

'হ্যাঁ। উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মার ঘরে যাবেন বলে।'

'আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন, মিঃ মিত্তির। মাঝরাত্তিরে মা-র ঘরে যাব, আর মা টের পাবেন না? মা রাত্তিরে তিনঘন্টার বেশি ঘুমোন না সেটা আপনি জানেন?'

'এমনিতে ঘুমোন না—কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে? ধরুন যদি ডাক্তারবাবু গতকাল তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?'

জয়ন্তবাবু আর ডঃ সরকার দুজনেরই ডোন্ট-কেয়ার ভাবটা মিনিটে মিনিটে

কমে আসছে সেটা বুঝতে পারছি। ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ এক বছর আগে যে কাঁচা কাজটা করেছিলেন, এবার আর সেরকম করলে চলত না। শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। সে চুরি ধরা পড়ত কবে তার কোনো ঠিক নেই। অবিশ্যি চাবি আপনার কাছে ছিলনা, তাই আপনার মা-র আলমারি থেকে ডুপলিকেট বার করে নিতে হয়েছিল। সেই সময় আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে আপনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই গায়ে একটা থান জড়িয়ে দরজার মুখে এসে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে আপনার মা জেগেই আছেন, এভরিথিং ইজ অল রাইট।



তারপরে আমাদের মনে এই ধাবণা বদ্ধমূল করার জন্য হামানদিস্তা পিটতে সরু করেন। এতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ হামানদিস্তায় পান থাকলে শব্দটা হয় একটু অন্যরকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।'

'সবই বুঝলাম, মিঃ মিত্তির,' বললেন জয়ন্তবাবু, 'কিন্তু তারপর?'

'তাবপর চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা।'

'আপনি কোন্ অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মিঃ মিত্তির? অজ্ঞান হবার ভান করা? আমার মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া? রাত্তিরে ফিরে এসে ডুপলিকেট চাবি বার করে সিন্দুক খোলা?'

'তার মানে এর সবগুলোই করেছেন বলে স্বীকার করছেন ত?'

'এর কোনোটার জন্য শাস্তি হয়না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারটায় আসছেন না কেন আপনি?'

'ঘটনা যে দুটো জয়ন্তবাবু, একটা ত নয়। আগে প্রথম ঘটনাটা সেরে নিই—এক বছর আগের চুরি।'

'সেটা আপনি সারবেন কি করে, মিঃ মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?'

'আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক ত ছিল। যিনি চুরি করেছিলেন তাঁর ঠিক পাশেই লোক ছিল। তাদেব মধ্যে অন্তত একজন কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না?'

এবারে শঙ্করবাবু কথা বললেন। তিনি বেশ উত্তেজিত।

'এটা আপনি কী বলছেন, মিঃ মিত্তির? চুরি হয়েছে সেটা জানবে অথচ আমায় বলবেনা, আমার এত কাছের লোক হয়ে?'

ফেলুদা এবার ম্যাজিশিয়ান কালিনাথবাবুর দিকে ঘুরল।

'আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলছিলেন সেটা বলবেন, কালিনাথবাবু?'

কালিনাথবাবু হেসে বললেন, 'অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করায় বিপদ নেই? শঙ্করের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুনত!'

'না, নেই বিপদ,' দৃঢ়স্বরে বললেন শঙ্করবাবু! 'অনেকদিন ব্যাপারটা ধামা চাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভালো। তুমি যদি কিছু জেনে থাক ত বলে ফেল, কালিনাথ।'

'সেটা বোধহয় ওঁর পক্ষে সহজ নয়, মিঃ মিত্তির,' বলল ফেলুদা, 'কারণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওঁর ও বিপদ হত। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন!'

'ব্ল্যাকমেল!'

'ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও স্বীকার করবেন না, চোরও স্বীকার করবেন না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত কালিনাথবাবু জানতেন না, উনি একজনকেই লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিং এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুরিটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই—'

'ভুল! ভুল! তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'সিন্দুক থেকে যা নেবার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। বনোয়ারিলালের আর একটি জিনিসও তাতে নেই! সিন্দুক খালি!'

'তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যি?'

'কিন্তু ... কাল রাত্তিরে কুকীর্তিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন?'

'সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু—ডঃ সরকার আর আপনি মিলে গতবছর বারোটার মধ্যে থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কিনা।'

জয়ন্তবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে; ডঃ সরকার দুহাতে রগ টিপে বসে আছেন।

'আমি স্বীকার করছি,' বললেন জয়ন্তবাবু। ফেলুদা পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা বার করে চালু করে আমার হাতে দিয়ে দিল।

'আমি দাদার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে স্বর্ণমুদ্রা ডঃ সরকারের কাছেই আছে, সেটা ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের দুজনেরই অর্থাভাব হয়েছিল। একটার

জায়গায় বারোটার পুরো সেটটা বিক্রী করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই···'

'তাই বাকি এগারোটা নেবার কথা ভাবছিলেন।'

'স্বীকার করছি, কিন্তু চোর আরো আছে মিঃ মিত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে—'

'—সে লোক চুরিও করতে পারে বলল ফেলুদা। কিন্তু তিনি চুরি করেননি।'

'তাহলে?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র।'

ফেলুদা ঘর থেকে বাকি মাল এনে টেবিলের উপর রাখল। সকলের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'এই হল বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি, বলল ফেলুদা, 'মেঝেতে চাবি না পেয়ে, এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে চাবিটা ছিল আপনার প্যাণ্টের ডান পকেটে। বাঁ পকেটে থাকলে পেতাম না। আপনাকে নিয়ে যাবার পর আমরা বৈঠকখানায় এসে বসি। তখনই এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো বার করে আমার ঘরে রেখে দিই। আমি জানতাম যে বিপদের আশঙ্কা আছে।—এই নিন আপনার চাবি, মিঃ চৌধুরী। এরপর কী করা হবে সেটা আপনিই স্থির করুন; আমার কাজ এখানেই শেষ।'

ফেরার পথে লালমোহনবাবুর মুখে আরেকটা আবৃত্তি শুনতে হল। এটাও বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা। নাম হল 'জিনিয়াস'—

'অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজ কী যে ছিল তা কে কবে?
দা ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।'



জুন মাসের মাঝামাঝি। স্কুল ফাইনাল দিয়ে বসে আছি, রেজাল্ট কবে বেরোবে জানি না। আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক দুটো বাজতে দশ মিনিটে এমন তেড়ে বৃষ্টি নামল যে সে আশা ত্যাগ করে একটা নতুন কেনা টিনটিনের বই নিয়ে বৈঠকখানায় তক্তাপোষে বসে বেশ মশগুল হয়ে পড়ছি। টুনটুনির বই না, টিনটিনের বই। টিনটিন ইন টিবেট। বেলজিয়াম থেকে ফরাসী ভাষায় বেরোয় এই আশ্চর্য কমিক বই। তারপর পৃথিবীর নানান ভাষায় অনুবাদ হয়। এখানে আসে ইংরিজিটা। আমার আর ফেলুদার দুজনেরই মতে রহস্য রোমাঞ্চ সাসপেন্স আর হাসিতে ভরা এর চেয়ে ভালো কমিক বই আর নেই। এর আগে আরও তিনটে কিনেছি, এটা নতুন, প্রথমে আমি পড়ব, তারপর ফেলুদা। ও এখন সোফায় কাত হয়ে শুয়ে দ্য চ্যারিয়ট অফ দ্য গড্‌স বলে একটা বই পড়ছে। পড়ছে মানে, একটু আগেও পড়ছিল, এখন শেষ করে সেটা বুকের ওপর রেখে সীলিঙে ঘুরন্ত পাখাটার দিকে চেয়ে আছে। মিনিটখানেক এইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'গিজার পিরামিডে ক'টা পাথরের ব্লক আছে জানিস? দুই লক্ষ।'

বেশ। জানলাম। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন পিরামিড নিয়ে পড়েছে বুঝলাম না। ফেলুদা বলে চলল, 'এই ব্লকের এক একটার ওজন প্রায় পনের টন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যা আন্দাজ করা যায় তার সাহায্যে দিনে দশটার বেশি ব্লক নিখুঁতভাবে পালিশ করে ঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে বসানো মিশরীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যেখানে পিরামিড, তার ত্রিসীমানায় ওই পাথর নেই। সে পাথর আসত নৌকো করে, নাইল নদীর ওপার থেকে। সাধারণ বুদ্ধিতেও হিসেব করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় জানিস? ওই একটি পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল কমপক্ষে ছ'শো বছর।'

ভাববার কথা বটে। বললাম, 'এটা কি ওই বইয়ে লিখেছে?'

'শুধু এটা নয়। প্রাচীন কালের আরো অনেক আশ্চর্য কীর্তির কথা এতে আছে সেগুলো কী করে সম্ভব হয়েছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন না, বা বলার চেষ্টাও করেন না। আমাদের দেশেই দেখ না। দিল্লীতে কুতুব মিনারের পাশে যে লৌহস্তম্ভ আছে তাতে দু'হাজার বছরেও মর্চে ধরেনি কেন? ইস্টার আইল্যান্ডের নাম শুনেছিস? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেই দ্বীপে গেলে দেখা যায়, কোন্ আদ্যিকালে কারা জানি পেল্লায় সব মানুষের মাথা পাথরে খোদাই করে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পাথর আছে দ্বীপের মাঝামাঝি; মাথাগুলো এনে রাখা হয়েছে সেখান

থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে। একেকটার ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন। জংলী লোকে কী করে এ জিনিসটা করল? লরি, ক্রেন, ট্র্যাক্টর, বুলডোজার—এসব ত তখন ছিল না!'

ফেলুদা এর মধ্যে একটা চারমিনার ধরিয়েছে। বইটা পড়ে ও যে বেশ উত্তেজিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, 'পেরুতে একটা জায়গায় মাইলের পর মাইল জুড়ে মাটির উপর জ্যামিতিক রেখা আর নকশা কাটা আছে। আদ্যিকাল থেকে সেটার কথা লোকে জানে; প্লেন থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ কবে কেন কীভাবে সেগুলো কাটা হল তা কেউ জানে না। রহস্য এতই গভীর যে সেটা নিয়ে কেউ ভাবতে চায় না।'

'যিনি ওই বইটা লিখেছেন তিনি ভেবেছেন বুঝি?'

'প্রচুর ভেবেছেন; আর ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আজ থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই অন্য কোন গ্রহ থেকে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত কোনো প্রাণী পৃথিবীতে এসে মানুষকে তাদের জ্ঞানের খানিকটা অংশ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পিরামিড ইত্যাদি হচ্ছে এই অতিমানবীয় টেকনলজির নিদর্শন, যাকে আজকের মানুষও টেক্কা দিতে পারেনি। কুরুক্ষেত্রে যেসব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আজকের অ্যাটমিক মারণাস্ত্রের মিল তা জানিস ত?'

'তার মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও কি অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে—'

ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই বাধা পড়ল। এই বৃষ্টির মধ্যেই কে জানি এসে আমাদের কলিং বেলটায় পর পর তিনবার সজোরে চাপ দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হুমড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন সিধুজ্যাঠা, আর তাঁর হাতের ছাতাটা ঝপাৎ করে বন্ধ করতেই আরো খানিকটা জল চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল।

'কী দুর্যোগ কী দুর্যোগ একটু চা বল তোমার ওই ভালো চা', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন সিধুজ্যাঠা। আমি এক দৌড়ে গিয়ে শ্রীনাথকে ঘুম ভাঙিয়ে তিন কাপ চা করতে বলে ফিরে এসে দেখি সিধুজ্যাঠা সোফায় বসে সাংঘাতিক ভ্রূকুটি করে টেবিলের উপরে রাখা চীনে মাটির অ্যাশট্রেটার দিকে চেয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি এই বাদলায় রিক্‌শা না নিয়ে—'

'মানুষ খুন ত আকচার হচ্ছে; তার চেয়েও সাংঘাতিক খুন কী জান?'

ফেলুদা থতমত, চুপ। আমি ত বটেই। যিনি প্রশ্নটা করেছেন তিনিই উত্তর দেবেন সেটাও জানি। সিধুজ্যাঠা বললেন, 'একথা সবাই মানে যে, আজকে আমাদের দেশটা উচ্ছন্নে যেতে বসলেও, এককালে অনেক কিছুই এখানে

ঘটেছিল যা নিয়ে আজও আমরা গর্ব করতে পারি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার বিষয়টা কি জান ত? সেটা হল আমাদের শিল্পকলা, যার অনেক নমুনা আমরা আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। কেমন, ঠিক কি না?'

'ঠিক।' ফেলুদা চোখ বুজে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'এই আর্টের মধ্যেও যেটা সেরা, সেটা হল ভারতবর্ষের মন্দির, আর তার গায়ের কারুকার্য। ঠিক কি না?'

'ঠিক।'

সিধুজ্যাঠা জানেন না এমন বিষয় নেই। তবে তার মধ্যেও আর্টের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাঁর তিন আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারিই হল আর্টের বই। কিন্তু খুনের কথা কী বলছিলেন সেটা এখনো বোঝা গেল না।

একটা মাদ্রাজি চুরুট ধরাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে দু'বার কেশে একটু দম নিয়ে সিধুজ্যাঠা বললেন, 'এককালে কালাপাহাড় ধর্ম চেঞ্জ করে হিন্দু মন্দিরের কী সর্বনাশ করে গেছে সে ত জান। কিন্তু আজ এই উনিশশ' তিয়াত্তরে আবার যে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে সেটা জান কী?'



'আপনি কি মন্দিরের গা থেকে মূর্তি খুলে নিয়ে ব্যবসা করার কথা বলছেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'এগজ্যাক্টলি!' সিধুজ্যাঠা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এটা যে কতবড় একটা ক্রাইম সেটা ভাবতে পার? দোহাইটা এখানে ধর্মেরও নয়, স্রেফ ব্যবসার। ধনী আমেরিকান টুরিস্টরা এইসব মূর্তি হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিনে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ ব্যাপারটা এমন গোপনে হচ্ছে যে ধরার কোনো উপায় নেই। তবে এইসব শিল্পহত্যাকারীদের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। আজ দেখলুম ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের একটা যক্ষীর মাথা গ্র্যান্ড হোটেলে এক আমেরিকান টুরিস্টের কাছে।'

'বলেন কি!' ফেলুদা রীতিমত অবাক। রাজারাণী যে ভুবনেশ্বরের একটা বিখ্যাত মন্দির সেটা আমিও জানতাম। ছেলেবেলা পুরী-ভুবনেশ্বর বেড়াতে গিয়েছিলাম, বাবা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লাল পাথরের মন্দির, তার গায়ে অদ্ভুত সব মূর্তি আর নকশা।

সিধুজ্যাঠা বলে চললেন, 'আমার কাছে কিছু পুরোন রাজপুত পেন্টিং ছিল, থার্টি-ফোরে কিনেছিলুম কাশীতে, সেইগুলো নিয়ে গিয়েছিলুম নগরমলকে দেখাতে। নগরমলের দোকান আছে জান ত গ্র্যান্ড হোটেলের ভেতরে?—আমার অনেক দিনের চেনা। ছবিগুলো খুলে রেখেছি কাউন্টারের উপরে, এমন সময় এই মার্কিন বাবুটি এলেন। মনে হল নগরমলের কাছ থেকে আগে কিছু জিনিসটিনিস কিনেছে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। বেশ ভারী জিনিস বলে মনে হল। মোড়কটি যখন খুললে না—বলব কি ফেলু—আমার হৃৎপিন্ডটা একটা লাফ মেরে গলার কাছে চলে এল। একটা মূর্তির মাথা। লাল পাথরের তৈরি। আমার চেনা মুখ, শুধু তফাত এই যে সে মুখকে ধড়ের সঙ্গে লাগা অবস্থায় দেখেছি, আর এখন দেখছি সেটাকে ছেনি দিয়ে ধর থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। আমার ত মুখ দিয়ে কথাই



বেরুচ্ছে না। নগরমল দেখে বললে জিনিসটা খাঁটি, ছাঁচ বা নকল নয়। সে মার্কিন ছোকরা বললে দু'হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে কোন্ প্রাইভেট ডিলারের কাছ থেকে। আমি মনে মনে বললুম—যা ভাবছি তাই যদি হয় তাহলে আরো দুটো শূন্য বাড়িয়ে নিলেও ন্যায্য দাম দেওয়া হত না। যাই হোক, সে ব্যাটা ত হোটেলে চলে গেল, আমি নিজেও ষোল আনা শিওর হতে পারছিলুম না, তাই সোজা বাড়ি এসে জিমারের বই খুলে দেখি কি — যা ভেবেছিলুম তাই, ও মুন্ডু খাস রাজারাণীর গা থেকে ভেঙে আনা হয়েছে। অথচ এসব মন্দিরে সরকারী পাহারা থাকে। ঘুষ খেয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল ত ওইটেই চাবিকাঠি কিনা। আমি অবিশ্যি এর মধ্যে ভুবনেশ্বরের আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্রেস চিঠি লিখে দিয়েছি। কিন্তু তাতেই বা কী হবে। ওই পার্টিকুলার মাথাটাকে ত আর বাঁচানো গেল না। আর মন্দির যা জখম হবার তাও হয়ে গেল।'

আমারও মনে হচ্ছিল যে এইভাবে আমাদের মন্দিরের মূর্তি ভেঙে বিদেশের লোককে বিক্রী করাটা সত্যিই একটা ক্রাইম।

শ্রীনাথ চা এনে দিয়েছে, সিধুজ্যাঠা কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভাবছি কীভাবে এর প্রতিকার হয়। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর কী করতে পারি বল। তাই, বুঝলে ফেলু, তোমার কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, অপরাধী খুঁজে বেড়াও তুমি, এর চেয়ে বড় আর কী অপরাধ থাকতে পারে? এই নিয়ে কাগজে

লেখালেখি করলে হয়ত পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাতেই বা কী ভরসা? এ ত আর সোনা রূপো বা হীরেজহরৎ নয়, যার দামটা বাজারদর থেকে হিসেব করে নেওয়া যায়। আর্টের ভ্যালুটা অন্যরকম; সেটা সবাই বোঝে না। আমি এমনও শিক্ষিত লোক জানি যারা জোড়বাংলা মন্দির দেখে বলে ওর মধ্যে আর কী আছে, আর কাংড়া ছবি দেখে বলে এর চেয়ে হেমেন মজুমদার ভালো।'

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল। এবার বলল, 'সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের নামটা জেনেছিলেন কি?'

'জেনেছি বৈকি। এই যে তার কার্ড।'

সিধুজ্যাঠা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে ফেলুদাকে দিল। উঠে গিয়ে দেখলাম তাতে নাম ছাপা রয়েছে—সল সিলভারস্টাইন—আর তার নিচে ঠিকানা।

'ইহুদী', সিধুজ্যাঠা বললেন।—'স্টাইন দেখলেই বুঝবে ইহুদী। লোকটা ডাকসাইটে ধনী তাতে সন্দেহ নেই। হাতে একটা ঘড়ি পরেছিল তেমন ঘড়ি বাপের জন্মে দেখিনি। তাবই দাম বোধহয় হাজাবখানেক ডলার।'

'ভদ্রলোক কদ্দিন থাকবেন কিছু বলেছিলেন?'

'কাল সকালেই কাটমুন্ডু চলে যাচ্ছে। অবিশ্যি এখন হয়ত তাকে ফোন করলে পেতে পার।'

ফেলুদা উঠে গিযে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। কলকাতার বেশির ভাগ জরুরী টেলিফোনের নম্বব ওর মুখস্ত। তার মধ্যে অবিশ্যি হোটেলও বাদ পড়ে না।

ফোন করে জানা গেল মিস্টার সিলভারস্টাইন তাঁর ঘরে নেই, কখন ফিরবেন কোনো ঠিক নেই। ফেলুদা যেন একটু হতাশ হয়েই ফোনটা বেখে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা মূর্তিটা বিক্রী করেছিল তার অন্তত চেহারার বর্ণনাটা পেলেও একটা রাস্তা পাওয়া যেত।'

'সেটা তো আমারই জিগ্যেস করা উচিত ছিল', সিধুজ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।—'কিন্তু কেমন জানি সব গন্ডগোল হয়ে গেল। ভদ্রলোক আবার আমার ছবিগুলো দেখছিলেন। দেখে বললেন, তার তান্ত্রিক আর্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট, আমি সন্ধান পেলে যেন তাকে জানাই। এই বলে তার একখানা কার্ড বের করে আমার হাতে দিলেন।.......সত্যি, তুমি যে কীভাবে প্রোসীড করবে তা তো আমার মাথায় আসছে না।'

'দেখি, ভুবনেশ্বর থেকে কোনো খবর আসে কি-না। রাজারাণীর গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে গেলে ত হৈ-চৈ পড়ে যাওয়া উচিত।'

সিধুজ্যাঠা এক চুমুকে চা-টা শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, 'বছরখানিক থেকে এ বাঁদরামির কথাটা কানে আসছিল, তবে অ্যাদ্দিন এদের নজরটা ছিল ছোটখাটো অখ্যাত মন্দিরের উপর। এখন মনে হচ্ছে এদের সাহসটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। আমার ধারণা অত্যন্ত বেপরোয়া ও শক্তিশালী কিছু লোক রয়েছে এই কেলেঙ্কারির পিছনে। ফেলু যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে পার ত দেশ তোমাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

সিধুজ্যাঠা চলে যাবার পর ফেলুদা গ্র্যান্ড হোটেলে রাত এগারটা পর্যন্ত বার বার ফোন করেও সেই আমেরিকানকে ধরতে পারল না। শেষবারের বার ফোনটা রেখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'সিধুজ্যাঠা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়—সত্যিই যদি ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা আমেরিকানদের হাতে চলে গিয়ে থাকে—তাহলে ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায়: আর যে লোক এই পাচারের কাজটা করেছে সে নিঃসন্দেহে একটা পয়লা নম্বরের ক্রিমিনাল। খারাপ লাগে ভাবতে যে আমার পক্ষে এগোনোর কোনো রাস্তা নেই। কোনই রাস্তা নেই।'

রাস্তা একটা বেরিয়ে গেল। পরদিনই। আর সেটা বেরোল এমন একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে ভাবলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে।

২

দুর্ঘটনার কথা বলার আগে আরেকটা জরুরী কথা বলা দরকার। সিধুজ্যাঠার আন্দাজ যে ঠিক সেটা পরদিনের আনন্দবাজারেই জানা গেল। আমিই প্রথম পড়লাম খবরটা—

মস্তকহীন যক্ষী

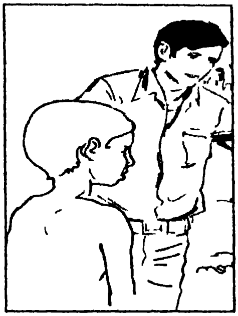
ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের গাএ থেকে একটি যক্ষীমূর্তির মস্তকাংশ অপহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের প্রহরীটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ওড়িশার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এ ব্যাপারে পুলিশী তদন্তের আয়োজন করেছে বলে জানা গেল।

খবরটা পড়ে ফেলুদাকে বললাম, 'তার মানে পাহারাদারই মাথাটা চুরি করেছে?'

ফেলুদা তার ফরহ্যানসের টিউবটা টিপে আধ ইঞ্চি পেস্ট বার করে ব্রাশের উপর চাপিয়ে বলল, 'এ চুরি কি আর পাহারাদারে করে? গরীব লোকের

অত সাহস হয় না। চুরি করেছে ভদ্রলোকে। সে মোটা ঘুষ দিয়েছে প্রহরীকে, প্রহরী তাই আপাতত গা ঢাকা দিয়েছে।'

সিধুজ্যাঠা নিশ্চয় খবরটা পেয়েছে। আমার মন বলছিল যে তাঁর আন্দাজ ঠিক হয়েছে জেনে তিনি নিশ্চয়ই সদর্পে সেটা ঘোষণা করতে আসবেন। শেষ পর্যন্ত এলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা চার ঘন্টা পরে, সাড়ে দশটার সময়। আজ বিষ্যুদবার, নটা থেকে আমাদের বিজলি বন্ধ হয়ে গেছে, এদিকে আকাশে মেঘ করে গুমোট হয়ে রয়েছে, বৈঠকখানায় বসে ঘামছি, এমন সময় দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা। দরজা খুলতেই আবার সেই হুমড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকা, চায়ের হুকুম, আর পরক্ষণেই ধপ্ করে সোফায় বসা। ফেলুদা ভুবনেশ্বরের কথাটা উচ্চারণ করতেই তিনি এক দাবড়ানিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওসব ছাড়। ওগুলো ফালতু কথা। রেডিও শুনেছ?'



'কই না ত। আসলে আজ—'

'জানি। বিষ্যুদবার। অথচ তাও একটা ট্রানজিস্টাব কিনবে না। যাক্‌গে... সাংঘাতিক খবর। কাটমুন্ডুর প্লেন ক্র্যাশ করেছে। কলকাতার কাছেই। এক ঘন্টা ডিলে ছিল। সাড়ে সাতটায় মাটি ছেড়েছে, ফিফ্‌টিন মিনিটসের মধ্যে ক্র্যাশ করেছে। ঝড়ে পড়েছিল। বোধহয় ফিরে আসবার চেষ্টা করছিল। কাল সারারাত কিরকম ঝোড়ো বাতাস ছিল সে ত জানই। আটান্নজন যাত্রী, অল ডেড। মার্কিন ব্যাঙ্কার সল সিলভারস্টাইন তার মধ্যে ছিলেন সে কথা রেডিওতে বলেছে।'

খববটা শুনে আমরা দুজনেই একেবারে থ। ফেলুদা বলল—

'কোথায় ক্র্যাশ করেছে? জায়গার নাম বলেছে?'

'সিদিকপুর বলে একটা গ্রামের পাশে। হাসনাবাদের দিকে। ফেলু, মনে মনে প্রার্থনা করেছিলুম যে মূর্তি যেন দেশ ছেড়ে না যায়। সে প্রার্থনা যে এমনভাবে মঞ্জুর হবে তা কি আর জানতাম?'

ফেলুদা হাতের রিস্টওয়াচের দিকে দেখল। সে কি সিদিকপুর যাবার মতলব করছে নাকি?

সিধুজ্যাঠারও কেমন যেন তটস্থভাব। বললেন, 'আমি যা ভাবছি, তুমিও নিশ্চয় সেই কথাই ভাবছ। প্লেন মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সপ্লোশন

হয়। যাত্রীর সঙ্গে তার ভেতরের জিনিসপত্রও চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ে। যেমন সব ক্র্যাশেই হয়। সেই জিনিসপত্রের মধ্যে যদি......'

ফেলুদা দু মিনিটের মধ্যে ঠিক করে ফেলল যে প্লেন যেখানে ক্র্যাশ করেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে যক্ষীর মাথাটা পাওয়া যায় কিনা। তিন ঘন্টা হল ক্র্যাশটা হয়েছে, যেতে লাগবে ঘন্টা দেড়েক। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এয়ারলাইনের লোক, দমকল, পুলিশ ইত্যাদি সেখানে গিয়ে তাদের কাজকর্ম খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে। আমরা গিয়ে কী কী দেখতে পাব জানি না; তবু যাওয়া দরকার। সুযোগ যখন আশ্চর্যভাবে এসে গেছে তখন সেটার সদ্ব্যবহার না করার কোন মানে হয় না।

সিধুজ্যাঠা বললেন, 'ছবিগুলো বিক্রি করে আমার হাতে কিছু কাঁচা টাকা এসেছে। আমি তার থেকে কিছুটা তোমাকে দিতে চাই। আফটার অল, আমার কথাতেই ত তোমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সুতরাং—'

'শুনুন, সিধুজ্যাঠা', ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকে এসেছে ঠিকই, কিন্তু আমি যদি নিজে এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ না করতাম তাহলে এগোতাম না। আমি কাল রাত্রে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, আর যতো ভেবেছি ততো মনে হয়েছে যে, আপনার কথাটা ষোল আনা সত্যি। দেশের মন্দিরের গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে যারা বিদেশীদের বিক্রি করে, তাদের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।'

'ব্র্যাভো!' সিধুজ্যাঠা চেঁচিয়ে উঠলেন!—'তবে একটা কথা বলে রাখি। আর্থিক না হলেও, অন্যরকম হেল্‌প তোমার লাগতে পারে। হয়ত আর্টের ব্যাপারে কোনো তথ্য জানার দরকার হতে পারে। তার জন্য আমার কাছে আসতে দ্বিধা কোর না। যদি সম্ভব হয়, তুমি নিজেও একটু আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করে ফেল—তাহলে উৎসাহটা আরো বেশি পাবে।'

ঠিক হল মাথাটা যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা সোজা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে জমা দিয়ে আসা হবে। কে চুরি করেছিল সেটা জানা না গেলেও, অন্তত চোরাই জিনিসটা ত উদ্ধার হবে।

ঝড়ের স্পীডে তৈরি হয়ে নিয়ে একটা হলদে ট্যাক্সিতে চেপে আমরা যখন সিদিকপুরের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন ঠিক এগারটা বাজতে পাঁচ। ফিরতে হয়ত বেলা হবে, এদিকে খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই—আমাদের বাড়িতে একটার আগে খাওয়া হয় না—তাই ঠিক হল ফেরার পথে যশোহর রোডে কোনো একটা পাঞ্জাবী দোকানে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওদিক দিয়ে লরি যাতায়াত

করে। লরির লোকেরা এইসব দোকানে খায়। রুটি, মাংস, তড়কা—দেখেই জিভে জল আসে। ফেলুদাকে দেখেছি ও সবরকম খাওয়াতে অভ্যস্ত। ওর দেখাদেখি আমিও সেই অভ্যাসটা করে নিতে চেষ্টা করছি।

কলকাতার ভিড় ছাড়িয়ে ভি আই পি রোডে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর দমদম ছাড়াবার কিছু পরেই মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল। হাসনাবাদ কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল। যশোহর রোড দিয়ে যেতে হয়। আমাদের ড্রাইভাব বললেন রাস্তা পিছল না থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতেন! —'ওদিকে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে জানেন ত স্যার? রেডিওতে বলল।'

ফেলুদা যখন বলল যে ওই ক্র্যাশের জায়গাতেই আমরা যাচ্ছি, তখন ভদ্রলোক ভারি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনার রিলেটিভ কেউ ছিল নাকি স্যার প্লেনে?'

'আজ্ঞে না।'

ফেলুদার পক্ষে ব্যাপাবটা খুলে বলা মুশকিল, অথচ ড্রাইভারবাবুর কৌতূহল মেটে না।

'সব তো পুড়ে ঝামা হয়ে গেচে শুনলাম। কিছু কি আর দেখতে

'আপনি কোনো সাংবাদিক-টাংবাদিক বোধহয়?'

'আজ্ঞে না। গপ্পো-টপ্পো লিখি আর কি।'

'অ। দেখে-টেখে সব নোট-টোট করে পরে বইয়ে-টইয়ে লাগিয়ে দেবেন।'

পাবেন গিয়ে?'

'দেখা যাক্।'

বারাসত ছাড়িয়ে মাইল দশেক যাবার পর থেকেই আমরা মাঝে মাঝে থেমে রাস্তার লোকের কাছ থেকে সিদিকপুরের নির্দেশ নিচ্ছিলাম। শেষটায় একটা বাজার টাইপের জায়গায় এসে একটা সাইকেলের দোকানের সামনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোককে জিগ্যেস করতেই তারা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল যে আর দু মাইল গেলেই বাঁ দিকে একটা কাঁচা রাস্তা পড়বে, সেটা ধরে মাইল খানেক গেলেই সিদিকপুর। এদের হাবভাবে বোঝা গেল এরা অনেককেই আগের রাস্তা বাতলে দিয়েছে।

কাঁচা পথটা একেবারেই গেঁয়ো। মাঝে মাঝে জল জমেছে, আর নানারকম টায়ারের দাগ পড়েছে কাদার উপর। ভাগ্যে এটা জুন মাস, সবে বর্ষা পড়েছে।

আর এক মাস পরে হলেই এ রাস্তা দিয়ে আর গাড়ি যেত না। আজ সকালের বৃষ্টিটা যে এদিকেও হয়েছে সেটা মাঠঘাটের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই শান্ত পাড়াগাঁয়ের মাঝখানে একটা ফকার ফ্রেণ্ডশিপ জেট প্লেন ক্র্যাশ করেছে ভাবতেও অবাক লাগছিল। ইতিমধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে পর পর তিনখানা অ্যাম্বাসাডার মেন রোডের দিকে চলে গেল। পায়ে হাঁটা লোকও কিছু পথে পড়ল—কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরছে।

সামনে একটা মোড়ের মাথায় একটা বটগাছের ধারে বেশ ভিড়। একটু এগিয়ে কয়েকটা গাড়ি ও একটা জীপ রাস্তার ধারে দাঁড় করানো রয়েছে। আমাদের ট্যাক্সি সেই গাড়িগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্র্যাশের কোনো



চিহ্ন নেই, তাও বুঝতে পারলাম এখানেই আমাদের নামতে হবে। ডানদিকে কিছু দূরে একটা গাছপালায় ভর্তি জায়গা, তারও কিছু দূরে বাঁদিকে একটা গ্রামের ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। জিগ্যেস করে জানলাম সেটাই নাকি সিদিকপুর। ক্র্যাশের জায়গা কোথায় জিগ্যেস করাতে বলল, 'ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনে। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন।'

আমাদের ড্রাইভার (নামটা জেনে গেছি—বলরাম ঘোষ) গাড়িতে চাবি দিয়ে চললেন, আমাদের সঙ্গে ক্র্যাশ দেখতে। আমরা মাঠের মধ্যে হাঁটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে যেটাকে বন বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে আট-দশটা বড় বড় আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ ছাড়া আর কিছুই না। সেগুলো পেরিয়েই একটা কলা বাগান, আর সেইখানেই যত কাণ্ড। গাছের মধ্যে যেগুলো এখনো নেড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো সব ঝলসে কালো হয়ে গেছে। ডানদিকে কিছু দূরে একটা নেড়া গাছ, ফেলুদা বলল সেটা শিমুল। তার বড় বড় ডালগুলো যেন তলোয়ারের কোপে কেটে ফেলা হয়েছে, আর যা দাঁড়িয়ে আছে তা পুড়ে ছাই। সমস্ত জায়গাটা লোকজন পুলিশ এয়ারপোর্টের কর্মচারীতে ভরে আছে, আর তাদের আশেপাশে প্রায় একশো গজ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফকার ফ্রেণ্ডশিপের ভগ্নাবশেষ। এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, ওইদিকে আবার থুবড়োনো নাকের খানিকটা। তাছাড়া ভাঙাছেঁড়া ফাটাফুটো দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া আধপোড়া সিকিপোড়া কত কী যে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনো

হিসাব নেই। একটা অদ্ভুত কড়া গন্ধে চারিদিকটা ছেয়ে রয়েছে যেটার জন্য আমার নাকে রুমাল দিতে হল। ফেলুদা জিভ দিয়ে ছিক্ করে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল, 'যদি আর ঘণ্টাখানেক আগেও আসতে পারতাম!'

আসলে, পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে, তাই, কাছে যাবার কোনো উপায় নেই।

আমরা অগত্যা ঘেরাও-করা জায়গাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। পুলিশ মাটি থেকে জিনিস তুলে তুলে দেখছে। কোনোটাই আস্ত নেই, তবে ভাঙা বা আধপোড়া অবস্থাতেও অনেক জিনিস দিব্যি চেনা যাচ্ছে। একটা স্টেথোস্কোপের কানেদেবার অংশ, একটা ব্রীফ কেস, জলের ফ্লাস্ক, একটা বোধহয় হ্যাণ্ডব্যাগের আয়না—যেটা একটা পুলিশ হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়ার ফলে তার থেকে রোদের ঝিলিক বেরোচ্ছে।

আমাদের ডানদিকে ক্র্যাশের জায়গা, আমরা তার পাশ দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁ দিকের একটা আমগাছের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

একটা ছেলে গাছের একটা নীচু ডালের উপর উঠে বসেছে, তার হাতে একটা কালসিটে পড়া সু-জুতো, যেটা নিশ্চয়ই চামড়ার ছিল, আর যেটা নিশ্চয়ই ছেলেটা এই জঞ্জালের মধ্যে থেকেই পেয়েছে।

ফেলুদা ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

'তোরা অনেক জিনিস পেয়েছিস এই জঞ্জাল থেকে, না রে?'

ছেলেটা চুপ। সে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে।

'কী হল? বোবা নাকি?'

ছেলেটা তাও চুপ। ফেলুদা 'হোপ্‌লেস' বলে এগিয়ে চলল ক্র্যাশের জায়গা ছেড়ে গ্রামের দিকে। বলরামবাবুর কৌতূহল আবার চাগিয়ে উঠেছে। বললেন, 'আপনি কিছু খুঁজছেন নাকি স্যার?'

'একটা লাল পাথরের মূর্তি', ফেলুদা জবাব দিল, —'শুধু মাথাটা।'

'শুধু মাথাটা....হুঁ....' বলরামবাবু দেখি এদিক ওদিক ঘাসের উপর খোঁজা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের তলায় একটা বাঁশের মাচা; তার উপর তিনজন আধবুড়ো বসে তামাক খাচ্ছে। যে সবচেয়ে বুড়ো সে ফেলুদাকে জিগ্যেস করল, 'আপন্যারা কোত্থিকে আয়লেঁন?'

'কলকাতা। খুব জোর বেঁচে গেছে আপনাদের গ্রামটা!'

'হ্যাঁ তা গ্যাচে বাবু। আল্লার কৃপা ঘর-বাড়ি ভাঙেনি মানুষজন মরেনি। বাছুর একটা বাঁধা ছিল করিমুদ্দির সেডা মোরেচে আর আলম শ্যাখের—'

'আগুন লাগল কখন?'

'মাটিতে য্যামন পড়ল অমনি য্যামন বোম ফাটার শব্দ ত্যামন শব্দ আর দাউ দাউ করে আগুন আর ধোঁয়া গোটা গেরামটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া। আর তারপর অ্যালো বৃষ্টি, দমকল অ্যালো—'

'দমকল আসা অবধি আগুন জ্বলছিল?'

'আগুন নেভেছে বৃষ্টির জলে।'

'আপনি কাছাকাছি গিয়েছিলেন আগুন নেভার পর?'

'আমি বুড়ো মানুষ আমার অতো কী গরজ....'

'ছেলে ছোক্‌রারা যায়নি? ওখান থেকে জিনিসপত্তর তুলে নেয়নি?'

বুড়ো চুপ। অন্য দুজনও উসখুস করছে। ইতিমধ্যে আট দশজন ছেলে জড়ো হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। ফেলুদা তাদের একজনকে ডেকে জিগ্যেস করল, 'তোর নাম কী রে?'

ছেলেটি ঘাড় কাত করে বলল, 'আলি।'

'এদিকে আয়।'

ফেলুদা নরম সুরে কথা বলছিল বলেই বোধহয় ছেলেটা এগিয়ে এল।

ফেলুদা তার কাঁধে হাত দিয়ে গলাটা আরো নামিয়ে বলল, 'ওই ভাঙা প্লেনটা থেকে অনেক জিনিস ছড়িয়ে বাইরে পড়েছিল, জানিস ত?'

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা লাল পাথরের তৈরি মেয়েমানুষের মাথা ছিল। কুমোর যেমন মাথা গড়ে, সেইরকম মাথা!'

'ওই ও জানে।'

আলি আরেকজন ছেলের দিকে দেখিয়ে দিল। ফেলুদা একেও জিগ্যেস করল, 'তোর নাম কি রে?'

'পানু।'

ফেলুদা বলল, 'আর কী নিয়েচিস তা আমার জানার দরকার নেই; মাথাটা ফেরত দিলে তোকে আমি বকশিশ দেব।'

পানুর মুখেও কথা নেই।

'বাবু জিগ্যেস করচে জবাব দে—', তিন বুড়োর এক বুড়ো ধমক দিয়ে উঠল।

'ওর কাছে নেই।'

কথাটা বলল পানুরই বয়সী, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আরেকটি ছেলে।

'কোথায় গেল?' চাবুকের মতো প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'আরেকজন বাবু এসেচিল, তিনি চাইলেন, তাকে দিয়ে দিয়েচি।'

'সত্যি কথা?' ফেলুদা পানুর কাঁধ ধরে প্রশ্ন করল। আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। পেতে পেতেও ফসকে যাবে যক্ষীর মাথা? পানু এবার মুখ খুলল।

'একজন বাবু এলেন যে গাড়ি করে একটুক্ষণ আগে।'

'কিরকম গাড়ি?'

'নীল রঙের!' —তিন চারটি ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল।

'কিরকম দেখতে বাবু? লম্বা? রোগা? চশমা পরা?....'

ছেলেদের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, প্যান্ট সার্ট পরা, রোগাও না মোটাও না ফরসাও না কালোও না, বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে; আমরা এসে পৌঁছানর আধ ঘণ্টা আগে এসে একে তাকে জিগ্যেস করে অবশেষে পানুর কাছ থেকে সামান্য কিছু বকশিশ দিয়ে একটা লাল পাথরের তৈরী মানুষের মাথা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। তার নীল রঙের গাড়ি।

আমরা যখন গ্রামের পথ দিয়ে গাড়িতে করে আসছিলাম তখন উল্টো দিক থেকে একটা নীল রঙের অ্যাম্বাসাডরকে আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

'চল্ তোপ্‌সে—আসুন বলরামবাবু!'

খবরটা শুনে ফেলুদা যদি হতাশও হয়ে থাকে, সে ভাবটা যে সে এর মধ্যে কাটিয়ে উঠে আবার নতুন এনার্জি পেয়ে গেছে সেটা তার ট্যাক্সির উদ্দেশে দৌড় দেখেই বুঝলাম। আমরাও দুজনে ছুটলাম তার পিছনে। কী আছে কপালে কে জানে!

৩

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার ফিরে চলেছি। দেড়টা বেজে গেছে, কিন্তু খাওয়ার কথা মনেই নেই। যশোহর রোডে পড়ে বলরামবাবু একবার বলেছিলেন, 'চা খাবেন নাকি স্যার? গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে....' ফেলুদা সে কথায় কান দেয়নি। বলরামবাবুও বোধহয় ব্যাপারটায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে আর চায়ের কথা বলেননি।

গাড়ি পঁচাত্তর কিলোমিটার স্পীডে ছুটে চলেছে, আর আমি ভাবছি কী অল্পের জন্যেই না মাথাটা ফস্‌কে গেল। সকালে যদি লোডশেডিংটা না হত, আ-র রেডিওর খবরটা যদি ঠিক সময়ে শুনতে পেতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ত আমরা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে ছুটে চলেছি। কিম্বা হয়ত সোজা ভুবনেশ্বর। মন্দিরের গায়ে ভাঙা মূর্তি আবার জোড়া লেগে যেত, আর ফেলুদা তার জোরে হয়ত পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী হয়ে যেত।



এই এক ঘণ্টার রোদেই রাস্তা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মনে মনে ভাবছি বলরামবাবু আরেকটু স্পীড তুললে পারেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ায় পাল্‌স রেট-টা ধাঁ করে বেড়ে গেল।

একটা গাড়ি-মেরামতের দোকানের সামনে একটা নীল অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে আছে।

বলরামবাবু যে সিদিকপুরের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছিলেন সেটা তার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম।

—'গাড়ি থামাব স্যার?'

'সামনের চায়ের দোকানটায়', ফেলুদা চাপা গলায় জবাব দিল।

বলরামবাবু স্টাইলের মাথায় মেরামতির দোকানের দুটো দোকানের পরে ট্যাক্সিটাকে রাস্তার ডানদিকে নিয়ে গিয়ে ঘ্যা-ষ করে ব্রেক কষলেন। ফেলুদা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তিন কাপ চা অর্ডার দিল। কাপ ত নয়, কাঁচের গেলাস।

'আর কী আছে ভাই?'

'বিস্কুট খাবেন? ভালো বিস্কুট আছে।'

কাঁচের বোয়ামের মধ্যে গোল গোল নানখাটাই-টাইপের বিস্কুট, ফেলুদা তারই দুটো করে দিতে বলল।

আমার চোখ নীল অ্যাম্বাসাডরের দিকে। পাংচার সারানো হচ্ছে। একটি ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, মাঝারি রং, বয়স চল্লিশ-টল্লিশ, ঘন ভুরু, ঘন হাতের লোম, কানের পাশ দিয়েও বোধহয় লোম বেরিয়েছে, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। গাড়ির পাশে ছটফট ভাব করে পায়চারি করছেন আর ঘন ঘন টান দিচ্ছেন আধপোড়া সিগারেটে। বাঙালী কী? কথা না বললে বোঝার উপায় নেই।

চা তৈরি হচ্ছে। ফেলুদা চারমিনার বার করে একটা মুখে পুরে পকেট চাপড়ে দেশলাই না-পাওয়ার ভান করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি আমাদের ট্যাক্সির কাছেই রয়ে গেলাম। দুই গাড়ির মধ্যে তফাত বিশ-পঁচিশ হাত। বলরামবাবুর আড়চোখ নীল গাড়ির দিকে।

'এক্সকিউজ মি. আপনার কাছে কি....'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে জ্বালিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'থ্যাঙ্কস্!' ফেলুদা ধোঁয়া ছাড়ল। 'টেরিব্‌ল ব্যাপার!'

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

'আপনি ত ক্র্যাশের ওখানে গিয়েছিলেন', ফেলুদা বলল।—'আপনার গাড়িটা যেন আসতে দেখলাম....?'

'ক্র্যাশ?'

'আপনি জানেন না? কাটমুণ্ডুর প্লেন....সিদিকপুরে....'

'আমি টাকি থেকে আসছি।'

টাকি হল হাসনাবাদের কাছেই একটা শহর।

আমরা কি তাহলে ভুল করলাম? গাড়ির নম্বরটা যদি দেখে রাখতাম তাহলে খুব ভালো হত।

'আর কতক্ষণ লাগবে হে?' ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন মোরামতি লোকটাকে।

'এই হয়ে গেল স্যার। পাঁচ মিনিট।'

চায়ের দোকান থেকে বলরামবাবু হাঁক দিয়ে জানালেন চা রেডি। ফেলুদা নীল গাড়ি ছেড়ে আমাদের হলদে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। হাতে গেলাস নিয়ে তিনজনে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসার পর ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'ডিনাই করছে। ডাহা মিথ্যেবাদী।'

আমি বললাম, 'কিন্তু নীল অ্যাম্বাসাডার ত' আরো অনেক আছে।

এ রংটা ত খুব কমন, ফেলুদা'।

আমি বললাম, 'কিন্তু নীল অ্যাম্বাসাডর ত আরো অনেক আছে। তোর নিজের স্যান্ডালটার দিকে চেয়ে দেখেছিস একবার?'

সত্যিই ত! স্যান্ড্যালের রংটাই বদলে গেছে ক্র্যাশের জায়গায় গিয়ে। আর ওই ভদ্রলোকেরও তাই। ব্রাউন জুতোয় কালোর ছোপ।

ফেলুদা যে ইচ্ছে করেই ধীরে সুস্থে বিস্কুট খাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট পরে অন্য গাড়িটা সুস্থ অবস্থায় মেরামতির দোকান থেকে বেরিয়ে যশোহর রোড দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। তার পরমুহূর্তেই আমাদের গাড়িও ধাওয়া করল তার

পিছনে। দুটোর মাঝখানে বেশ অনেকখানি ফাঁক, কিন্তু ফেলুদা বলল সেই ভালো; লোকটার সন্দেহ উদ্রেক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দমদমের কাছে এসে হঠাৎ আরেক পশলা বৃষ্টি নামল। সামনে সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, ভালো দেখা যাচ্ছে না, তাই বলরামবাবুকে বাধ্য হয়েই স্পীড বাড়িয়ে নীল গাড়ির আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে পড়তে হল। ভদ্রলোক বেশ রসিক; বললেন, 'হিন্দি ফিলিমের মতন মনে হচ্ছে স্যার। সেদিন শত্রুঘনের একটা বইয়ে দেখলুম এইভাবে গাড়ির পিছনে গাড়ি ফলো করছে। অবিশ্যি সেখানে পেছনের গাড়িটা একটা পাহাড়ের গায়ে ক্র্যাশ করল।'

ফেলুদা বলল, 'একদিনে একটা ক্র্যাশ যথেষ্ট। আপনি স্টেডি থাকুন। কলকাতায় পাহাড় না থাকলেও—'

'কী বলচেন স্যার! থার্টিন ইয়ারস গাড়ি চালাচ্ছি—এখনো পর্যন্ত একটিও নট এ সিঙ্গল অ্যাক্সিডেন্ট।'

'ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রী ফোর নাইন' ফেলুদা বিড়বিড় করে বলল। আমিও নম্বরটা মাথায় রেখে দিলাম, আর বার বার 'পাঁতিচান.... পাঁতিচান...পাঁতিচান' আওড়ে নিলাম। এটা আর কিছুই নয়—পাঁচ তিন চার আর ন'য়ের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি। নম্বর মনে রাখার দু'তিন রকম উপায় ফেলুদা শিখিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে এটা একটা।

বলরামবাবু সত্যিই বাহাদুর ড্রাইভার, কারণ কলকাতার ট্র্যাফিকে ভরা গিজগিজ রাস্তা দিয়েও ঠিক নীল গাড়িকে সামনে রেখে চলেছেন। কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা কে জানে।

'মূর্তিটা নিয়ে কী করবে বল ত লোকটা?' শেষ পর্যন্ত জিগ্যেস করলাম ফেলুদাকে।

'ভুবনেশ্বরে ফেরত নিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। যে জাতের ধুরন্ধর, তাতে মনে হয় আবার আরেকজন বিদেশী খদ্দের জোগাড় করার চেষ্টা করবে। একই জিনিস উপরো-উপরি দুবার বিক্রি করার এমন সুযোগ ত চট করে আসে না।'

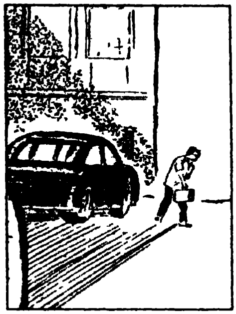
নীল গাড়ি শেষ পর্যন্ত দেখি আমাদের পার্ক স্ট্রীটে এনে ফেলেছে। পুরোন গোরস্থান ছাড়িয়ে, লাউডন স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে শেষে গাড়ি দেখি হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কুইন্‌স ম্যানসনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

'যাব স্যার?'

'আলবৎ।'

আমাদের ট্যাক্সিও গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা; তার মাঝখানে একটা পার্ক, আর চারদিকে ঘিরে রয়েছে পাঁচ-ছ তলা উঁচু সব বাড়ি। পার্কের চারদিকে গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, তাঁর মধ্যে আবার দু-একটা স্কুটারও রয়েছে। আমাদের ডান দিকে কুইন্‌স ম্যানসন। আমরা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম, নীল গাড়ির কিছু দূরে একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল। আমরা গাড়ির ভিতরে বসে আছি কী হয় দেখার জন্য।

ভদ্রলোক একটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে নামলেন, দরজার কাঁচ তুললেন, দরজা লক করলেন, তারপর ডান দিকে গিয়ে একটা বড় দরজা দিয়ে কুইন্‌স ম্যানসনে ঢুকে গেলেন।



এক মিনিট অপেক্ষা করে ফেলুদাও ট্যাক্সি থেকে নামল, আমি তার পিছনে। সোজা চলে গেলাম সেই দরজার দিকে। একটা ঘড় ঘড় শব্দ আগেই কানে এল; গিয়ে দেখি দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা আদ্যিকালের লিফ্‌ট, সেটা সবেমাত্র নীচে নেমেছে। ঝটপটাং শব্দ করে লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল দরজা খুলে বুড়ো লিফ্‌টম্যান খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা হঠাৎ একটা ব্যস্ততার ভাব করে তাকে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার সেনগুপ্ত এইমাত্র ওপরে গেলেন না?'

'সেনগুপ্ত কৌন?'

'এইমাত্র যিনি ওপরে গেলেন?'

'আভ্‌ভি গিয়া পাঁচ নম্বরকা মিস্টার মল্লিক। সেনগুপ্তা ইঁহা কোই নেহি রহ্‌তা।'

'ও। আমারই ভুল।'

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট। মিস্টার মল্লিক। এগুলো মনে রাখতে হবে। ফেলুদা খাতা আনেনি; বাড়ি গিয়ে নোট করে নেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু বাড়ি ফিরতে যে এখনো দেরি সেটা একটু পরেই বুঝলাম। ফেলুদা বলরামবাবুকে ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দিল, ভদ্রলোক যাবার সময় একটা স্লিপ দিয়ে বলে গেলেন, 'এটা আমার পাশের বাড়ির টেলিফোন, আপনি বললে আমায় ডেকে দেবে। দরকার-টরকার পড়লে একটু খবর দেবেন স্যার। একঘেঁয়ে কাজের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে....।'

পার্ক স্ট্রীট থানার ও সি মিস্টার হরেন মুৎসুদ্দির সঙ্গে ফেলুদার আলাপ ছিল। দু'বছর আগে হ্যাপি-গো-লাকি বলে একটা রেসের ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে

মারার রহস্য ফেলুদা আশ্চর্যভাবে সমাধান করেছিল; তখনই মুৎসুদ্দির সঙ্গে আলাপ হয়। আমরা এখন তাঁর আপিসে। ভদ্রলোক মূর্তি চুরির খবরটা কাগজে পড়েছেন। ফেলুদা সেইখান থেকে শুরু করে আজকের পুরো ঘটনাটা তাঁকে বলে বলল, 'যদ্দুর মনে হয় এই মল্লিক চুরির ব্যাপারটা নিজে না করলেও চোরাই মাল উদ্ধার করে সেটাকে পাচার করার ভারটা নিজেই নিয়েছে। তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইনফরমেশন, আর একটি লোক তার পিছনে রাখা—এই দুটো অনুরোধ করতে আমি এসেছি। তার কার্যকলাপের দিকে একটু নজর রাখা দরকার। মিস্টার মল্লিক, পাঁচ নম্বর কুইন্‌স ম্যানসন, নীল অ্যাম্বাসাডর, নম্বর ডব্লু এম এ ফাইভ থ্রী ফোর নাইন।'

মুৎসুদ্দি এতক্ষণ একটা পেনসিল কানের মধ্যে গুঁজে বসেছিলেন, এবার সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'হবে। আপনি যখন বলছেন তখন হবে। একটা স্পেশাল কনস্টেব্‌ল লাগিয়ে দিচ্ছি, সে ওকে চোখে চোখে রাখবে। আর আমাদের ফাইলে যদি কিছু থাকে তাও দেখছি। থাকবেই যে এমন কোনো কথা নেই যদি না লোকটা এর আগে কোনো গণ্ডগোল করে পুলিশের নজরে এসে থাকে।'

'ব্যাপারটা খুব আর্জেন্ট কিন্তু। মূর্তি আবার বেহাত হলেই মুশকিল।'

মুৎসুদ্দি মুচকি হেসে বললেন, 'কেন, মুশকিল কেন? আমরা ত আর ঘোড়ার ঘাস কাটি না, মিস্টার মিত্তির। আপনি একা ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা কি আর রিফিউজ কবব? আমরা আছি কিসের জন্য? পাবলিককে হেল্‌প করার জন্যেই ত? তবে একটা কথা বলি—একটা অ্যাডভাইস; অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—এই সব র‍্যাকেটের পেছনে মাঝে মাঝে এক একটা দল থাকে—গ্যাং—এবং তারা বেশ পাওয়ারফুল হয়। গায়ের জোর বলছি না। পয়সার জোর। পোজিসনের জোর। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকেরা যখন নোংরা কাজে নামে, তখন সাধারণ ক্রিমিনালদের চেয়ে তাদের বাগে আনা অনেক বেশি শক্ত হয়, জানেন ত? আপনি ইয়াং ট্যালেণ্ডেড, তাই আপনাকে এগুলো বলছি—নইলে আর আমার কী মাথাব্যথা বলুন!....'

ওয়লডর্ফে চীনে খাবার অর্ডার দিয়ে ফেলুদা ম্যানেজারের ঘর থেকে কুইন্‌স ম্যানসন পাঁচ নম্বরে টেলিফোন করে, হ্যালো শুনেই ফোনটা রেখে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'লোকটা এখনো ঘরেই আছে।'

আমরা বাড়ি ফিরলাম পৌনে তিনটেয়। চারটের কিছু পরে মিস্টার মুৎসুদ্দির টেলিফোন এল। প্রায় পাঁচ মিনিট কথা হল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা

তার খাতায় নোট করে নিল। তারপর আমি না জিগ্যেস করতেই আমার কৌতূহল মিটিয়ে দিল।—

'লোকটার পুরো নাম জয়ন্ত মল্লিক। দিন পনের হল কুইন্স ম্যানসনে এসে রয়েছে। ফ্ল্যাটটা আসলে মিস্টার অধিকারী বলে একজন ভদ্রলোকের। ইনি ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক রেস্টোরেন্টের মালিক। বোধহয় মল্লিকের বন্ধু। অধিকারী এখন দার্জিলিঙে। তার অবর্তমানে ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করছে। গাড়িটাও অধিকারীর। সেই গাড়ি করেই মল্লিক আজ তিনটে নাগাদ গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর আবার ভিতরে ঢোকে। দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে করে ডালহৌসি যায়। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য মুৎসুদ্দির লোক ওকে হারিয়ে ফেলে, তারপর ফেয়ারলি প্লেসে রেলওয়ে বুকিং অফিসের বাইরে গাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে দেখে, মল্লিক কিউয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে। এখান থেকে মনমড, সেখান থেকে আওরঙ্গাবাদ। সেকেণ্ড ক্লাসের রিজার্ভ টিকিট। আরো খবর থাকলে পরে টেলিফোন করবে।'

'আওরঙ্গাবাদ যাচ্ছে?' আমি জায়গাটার নামই শুনিনি।

'আওরঙ্গাবাদ', ফেলুদা বলল। 'আর আমরা এখন যাচ্ছি সর্দার শঙ্কর রোড, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বোসের বাড়ি। একটা কনসালটেশনের দরকার।'

৪

'আওরঙ্গাবাদ!'

সিধুজ্যাঠার চোখ কপালে উঠে গেল। —'এ যে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি! জায়গাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ ফেলু? আওরঙ্গাবাদ হল এলোরায় যাবার ঘাঁটি। মাত্র বিশ মাইলের পথ, চমৎকার রাস্তা। আর এলোরার মানে বুঝতে পারছ ত? এলোরা হল ভারতের সেরা আর্টের ডিপো! পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা কৈলাসের মন্দির —যা দেখে মুখের কথা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আর তাছাড়া পাহাড়ের গায়ে লাইন করে দেড় মাইল জায়গা জুড়ে আরো তেত্রিশটা গুহা—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—তার প্রত্যেকটা মূর্তি আর কারুকার্যে ঠাসা। আমার ত ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে! ....কিন্তু প্লেন থাকতে ট্রেনে যাচ্ছে কেন লোকটা?'

'যদ্দূর মনে হয়, মূর্তিটা ও হাতের কাছে রাখতে চাইছে। প্লেনে গেলে সিকিউরিটি চেক-এর ব্যাপার আছে। হাতের ব্যাগ খুলে দেখে পুলিশ। ট্রেনে সে ঝামেলা নেই।'

আওরঙ্গাবাদের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমারও গলা শুকিয়ে গেল। ফেলুদা হাতের ঘড়ির দিকে দেখে তড়াক্ করে মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল।

'কী ঠিক করলে?' সিধুজ্যাঠা, জিগ্যেস করলেন।

'আমাদের প্লেনেই যেতে হবে।'

সিধুজ্যাঠা যে ভাবে ফেলুদার দিকে চাইলেন তাতে বুঝলাম গর্বে ওঁর বুকটা ভরে উঠেছে। মুখে কিছু না বলে তক্তাপোষ থেকে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা চটি বই বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমায় হেল্প করবে। ভালো করে একবারটি পড়ে নিও।'

বইটার নাম 'এ গাইড টু দ্য কেভস এলোরা।'

ফেলুদা বাড়ি এসেই জুপিটার ট্র্যাভলসের মিস্টার বক্সীকে ফোন করে জিগ্যেস করল আগামী কাল সকালের বম্বে ফ্লাইটে টিকিট আছে কি না; ওর তিনটে সীট দরকার। তিনটে শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সিধুজ্যাঠাও যাবেন নাকি সঙ্গে? ফেলুদাকে জিগ্যেস করাতে ও শুধু বলল, 'দলে আরেকটু ভারি হলে সুবিধে হয়।'

বক্সী বললেন, 'এমনিতে জায়গা নেই, তবে ওয়েটিং লিস্টে ভালো পোজিশন। আমি টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি। আপনারা সকালে সাড়ে পাঁচটাব মধ্যে এয়ারপোর্টে এসে যাবেন। মনে হয় হয়ে যাবে।'

সকালের ফ্লাইট নটার মধ্যে বম্বে পৌঁছে যাবে; তারপর সেখান থেকে সাড়ে বারোটার সময় আরেকটা প্লেন দেড়টার সময় আমাদের আওরঙ্গাবাদ পৌঁছে দেবে। এই পরের টিকিটটাও জুপিটার করে দেবে, আর করে দেবে আমাদের আওরঙ্গাবাদ ও এলোরায় থাকার ব্যবস্থা। আমরা পৌঁছে যাব কালই, মানে শনিবার, আর মল্লিক পৌঁছবেন রবিবার।

বুকিং-এর ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুদা আরেকটা নম্বর ডায়াল করছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি নাম্বার ওয়ান জনপ্রিয় রহস্যরোমঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। ফেলুদা যেন ভূত দেখেছে এমন ভাব করে রিসিভারটা রেখে দিয়ে বলল, ''আশ্চর্য— এই মুহূর্তে আপনার নম্বর ডায়াল করছিলাম!'

জটায়ু তার ভাঁজ করা প্লাস্টিকের রেনকোটটা টেবিলের উপর রেখে সোফায় বসে পড়ে বললেন, 'তাহলে আমার সঙ্গে আপনার একটা টেলিপ্যাথেটিক যোগ রয়েছে বলুন! আমারও ক'দিন থেকেই আপনার কথা মনে হচ্ছে।'

কথাটা আসলে হবে টেলিপ্যাথিক, কিন্তু লালমোহনবাবুর ইংরিজি ওইরকম। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে; দেখে মনে হল বই লিখে বেশ দু' পয়সা রোজগার হচ্ছে।

'বেশ করে একটু লেবুর সরবৎ করতে বলুন ত আপনার সারভেন্টটিকে—বড্ড গুমোট করেছে। আর ফ্রিডিজেয়ার থেকে যদি একটু বরফ দিয়ে দেয়....'

সরবতের অর্ডার দিয়ে ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

'খুব ব্যস্ত নাকি? নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন?'

'হাত দিলে কি আর এখানে আসতে পারি? ছক কেটিচি। খুব জমবে বলে মনে হয়। ভালো ফিলিম হয়। অবিশ্যি হিন্দি প্যাটার্নের। পাঁচখানা ফাইট আছে। বেলুচিস্তানের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ফেলিচি আমার হিরো প্রখর রুদ্রকে। আচ্ছা—অর্জুন মেরহোত্রাকে কেমন মানায় বলুন ত হিরোর পার্টে? অবিশ্যি আপনি যদি অ্যাকটিং করতে রাজী হন তাহলে ত—'



'আমি হিন্দি জানি না। যাই হোক্, আপাতত আমাদের সঙ্গে আসুন— কৈলাসটা ঘুরে আসি। ফিরে এসে না হয় বেলুচিস্তানের কথা ভাববেন।'

'কৈলাস! সে কি মশাই—আপনার কি তিব্বতে কেস পড়ল নাকি? সেখানে ত শুনিচি চীনেদের রাজত্ব।'

'কৈলাস পাহাড় নয়। কৈলাস মন্দির। এলোরার নাম শুনেছেন?'

'ও হো হো, তাই বলুন। তা সে তো শুনিচি সব মন্দির আর মূর্তি-টূর্তির ব্যাপার। আপনি হঠাৎ পাথর নিয়ে পড়লেন কেন? আপনার ত মানুষ নিয়ে কারবার।'

'কারণ, কতকগুলো মানুষ ওই পাথর নিয়ে একটা কারবার ফেঁদে বসেছে। বিশ্রী কারবার। সেটা বন্ধ করা দরকার।'

লালমোহনবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সব শুনেটুনে লালমোহনবাবুর গোল চোখ আরো গোল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে কি সব লিখেটিখে নিয়ে বললেন—

'এ এক নতুন খবর দিলেন আপনি। এই সব পাথরের মূর্তির এত দাম? আমি ত জানতুম হীরে পান্না চুনি—এই সব হল দামী পাথর। যাকে বলে প্রেশাস স্টোন্‌স। কিন্তু এও ত দেখছি কম প্রেশাস নয়।'

'আরো বেশি প্রেশাস। চুনি পান্না পৃথিবীতে হাজার হাজার আছে, ভবিষ্যতে সংখ্যায় আরো বাড়বে। কিন্তু কৈলাসের মন্দির বা সাঁচির স্তূপ বা এলিফ্যান্টার গুহা এসব একটা বৈ দুটো নেই। হাজার দু' হাজার বছর আগে আমাদের আর্ট যে হাইটে উঠেছিল সে হাইটে ওঠার কথা আজকের আর্টিস্ট ভাবতেই পারে না। সুতরাং সে যুগের আর্ট দেশে যা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যারা তাকে নষ্ট করতে চায় তারা ক্রিমিন্যাল। আমার মতে ভুবনেশ্বরের যক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে। যে করেছে তার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার।'

লালমোহনবাবুকে তাতাবার জন্য এই যথেষ্ট। এমনিতেই ভদ্রলোকের নতুন দেশ দেখার শখ, তার ওপর ফেলুদার সঙ্গে একজন অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করা—সব মিলিয়ে ভদ্রলোক ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। প্লেনের টাইম,



জামা-কাপড় কী নিতে হবে, মশারি লাগবে কি না, সাপের ওষুধ লাগবে কি না ইত্যাদি জেনে নিয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'আরো এক্সাইটেড লাগছে কেন জানেন ত? কৈলাস নামটার জন্য। কৈলাস—কই লাশ! বুঝতে পারছেন ত?

ক'দিনের জন্য যাচ্ছি জানা নেই, তবে দিন সাতেকের বেশি হবে না আন্দাজ করে প্যাকিং সেরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। ফেলুদাকে প্রায়ই তদন্তের ব্যাপারে যেতে হয়, তাই ওর একটা আলাদা স্যুটকেসে কিছু জরুরী জিনিস আগে থেকেই প্যাক করে রেডি করা থাকে। তার মধ্যে ওষুধপত্র, ফার্স্ট-এড বক্স, মেক-আপ বক্স, বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ক্যামেরা, ইস্পাতের তৈরী পঞ্চাশ ফুট টেপ, একটা অল-পরপাস নাইফ, নানারকম সরু সরু তার—যা দিয়ে দরকার হলে চাবি ছাড়াই তালা-টালা খোলা যায়, একটা নিউম্যান কোম্পানির ব্র্যাডশ—বা রেল-প্লেন-বাসের টাইম টেবিল, একটা রোড ম্যাপ, একটা লম্বা দড়ি, এক জোড়া হান্টিং বুট। এতে জায়গা যে খুব একটা বেশি নেয় তা নয়; তাই একই স্যুটকেসে ওর বাকি জিনিসও ধরে যায়। জামা-কাপড় বেশি নেয় না। এককালে পোশাকের শখ ছিল, এখন কমে গেছে। সিগারেট খাওয়াও দিনে বিশটা থেকে দশে নেমে গেছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর চিরকালই যত্ন। যোগব্যায়াম করে, একগাদা খায় না, তবে নতুন গুড়ের সন্দেশ বা খুব ভালো মিহিদানা পেলে সংযমের তোয়াক্কা রাখে না।

ফেলুদার কাছে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো চটি বই ছিল তার মধ্যে এবার যেগুলো লাগতে পারে তার কয়েকটা নিয়ে আমি উল্টেপাল্টে

দেখে নিলাম। দশটা নাগাদ শোবার আগে ফেলুদা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল, আর যদি কোনো কারণে অ্যালার্ম না বাজে তাই ওয়ান সেভেন থ্রীতে টেলিফোন করে সকালে চারটের সময় ঘুম ভাঙিয়ে দেবার কথা বলে দিল।

তার ঠিক দশ মিনিট বাদে মিস্টার মুৎসুদ্দির কাছ থেকে ফোন এলো। বললেন, মল্লিক বম্বে থেকে একটা ট্রাঙ্ক কল পেয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। মল্লিক যে কথাগুলো বলে তা হল এই—'মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে গেছে। বাপ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বিশ পঁচাত্তর।' তাতে বম্বের লোক ইংরিজিতে বলে, 'ক্যারিঅন। বেস্ট অফ লাক্।''

আমি কথাগুলোর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। সেটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'তোর মধ্যমনারায়ণ তেলের দরকার হয়ে পড়েছে।'

ভাগ্যিস এই তেলের ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, তা না হলে এটারও মানে ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে হত। মধ্যমনারায়ণ তেল মাথায় লাগালে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয় আর বুদ্ধি বাড়ে।

বম্বের প্লেন সাড়ে ছটায় না ছেড়ে ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। বেশ কয়েকটা ক্যানসেলেশন ছিল, তাই আমাদের জায়গা পেতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছিলেন লালমোহনবাবু। এটা বোধ হয় দ্বিতীয়বার। এবার দেখলাম টেক-অফের সময় দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে সেই বিশ্রী ব্যাপারটা আর করলেন না। কিন্তু প্রথম দিকটা যখন আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন প্লেনটা বেশ ধড়ফড় করছিল, আর লালমোহনবাবুর অবস্থা আরো অনেকেরই মতো বেশ শোচনীয় বলে মনে হচ্ছিল। একবার একটা বড় রকম ঝাঁকুনির পর ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে বললেন, 'এ যে মশাই চিৎপুর রোড দিয়ে ছ্যাক্ড়া গাড়িতে করে চলেছি বলে মনে হচ্ছে! নাটবল্টু সব খুলে আসচে না ত?'

আমি আর ফেলুদা দুটো পাশাপাশি সীটে বসেছিলাম, আর লালমোহনবাবু বসেছিলেন প্যাসেজের ওদিকে ফেলুদার ঠিক পাশেই। ব্রেকফাস্ট খাবার কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক একবার ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁত-খড়কের ইংরিজি কী মশাই?' তারপর সেটা জেনে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই বোতাম টিপে এয়ার হোস্টেসকে ডাকিয়ে এনে, 'এক্সকিউজ, টুথপিক প্লীজ' বলে খড়কে আদায় করে নিলেন। তারপর ঘণ্টা খানেক পরে বম্বে সম্বন্ধে একটা বুকলেট পড়তে পড়তে বললেন, 'অ্যাপোলোটা আবার কিরকম বাঁদর মশাই?'

ফেলুদা এলোরার গাইড বুকটা চোখের সামনে থেকে নামিয়ে বলল 'বাঁদর নয়, বন্দর। পোর্ট।'

'ও, পোর্ট! তাহলে ইংরিজিতে পোর্ট লিখলেই হয়, বান্দার লেখার কী দরকার? হুঁ!'

আমরা তিনজনে কেউই আগে বম্বে যাই নি। পশ্চিমে সবচেয়ে দূরে গেছি রাজস্থানের জয়সলমীর। এবার এমনিতে বম্বেতে থাকার কথা নয়, তবে ফেলুদা বলেছে এলোরায় সব ঠিক ভাবে উৎরে গেলে ফিরবার পথে দু-তিনদিন বম্বে থেকে আসবে। ওর এক কলেজের বন্ধু ওখানে থাকে, গ্ল্যাক্সো কোম্পানিতে কাজ করে, সে অনেকদিন থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে। প্লেন ল্যান্ড করার আগে যখন বেল্ট বাঁধতে বলছে, তখন আমি ফেলুদাকে একটা কথা জিগ্যেস না করে পারলাম না। বললাম, 'মল্লিকের কাল রাত্রে টেলিফোনের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে?'

ফেলুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কি রে—তুই ওটা সত্যিই বুঝিস নি?'

'উহুঁ।'

'মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। মেয়ে হল যক্ষীর মাথা, শ্বশুরবাড়ি হল সিলভারস্টাইন—যে মাথাটি কিনেছিল, আর বাপেব বাড়ি হল মল্লিক— যার কাছে মাথাটা ছিল।'

বুঝিয়ে দিলে সত্যিই জলের মতো সোজা। বললাম, 'আর বিশ-পঁচাত্তর?'

ওটা ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড। ম্যাপ খুলে দেখবি ওটা আওরঙ্গাবাদে পড়ছে।'

স্যান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে নামলাম দশটার সময়। আড়াই ঘণ্টা পরে আবার প্লেন ধরতে হবে, তাই শহরে যাবার কোনো মানে হয় না—যদিও আকাশ থেকে শহরের গম্‌গমে চেহারা দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্টের বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে রেস্টোবাণ্টে ভাত আর মুরগীব কাবী খেয়ে আওরঙ্গাবাদ যাবার প্লেনে উঠলাম পৌনে একটায়। মাত্র এগারোজন যাত্রী। ফেলুদা বলল এটা টুরিস্ট সীজন নয় তাই এত কম লোক। আওরঙ্গাবাদে যারা যায় তারা অনেকেই নাকি অজন্তা-এলোরা দেখতেই যায়।

এবার আমি আর লালমোহনবাবু পাশাপাশি, আর প্যাসেজের উল্টো দিকে ফেলুদা, আর তার পাশে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক —তার চোখে মোটা কালো চশমা, নাকটা খাঁড়ার মতো লম্বা আর ব্যাঁকা, আর চওড়া কপালের পিছন দিকে একরাশ কাঁচাপাকা ঢেউ খেলানো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো।

আওরঙ্গাবাদের খুদে এয়ারপোর্টে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। হত না, কিন্তু তাঁর নাকি গাড়ি আসার কথা ছিল, আসে নি, তাই উনি আমাদের সঙ্গে এয়ারলাইনসের বাসে শহরে এলেন। বাঙালী বলে মনে হয় নি, তাই যখন ফেলুদার সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন তখন বেশ অবাক লাগল।

'কোথায় উঠছেন?' ফেলুদাকে জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোক।

'আওরঙ্গাবাদ হোটেল।'

'আমিও তাই। ....এদিকে কী? বেড়াতে?'

'হ্যাঁ, সেইরকমই। আপনি?'

'আমি এলোরা নিয়ে একটা বই লিখছি। আগে আরেকবার গেছি, এটা দ্বিতীয়বার। ইন্ডিয়ান আর্ট হিস্ট্রি পড়াই মিশিগানে।'

'ছাত্রদের উৎসাহ আছে?'

'আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজকাল ত ইন্ডিয়ার দিকেই চেয়ে আছে ওরা। বিশেষত ইয়াং জেনারেশন।'

'বৈষ্ণব ধর্মের খুব প্রভাব শোনা যাচ্ছে?' ফেলুদা একটু ঠাট্টার সুরেই প্রশ্নটা করেছিল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হরেকৃষ্ণর কথা বলছেন ত? জানি। তবে ওরা কিন্তু খুব সিরিয়াস। মাথা মুড়িয়ে ফোঁটা কেটে ধুতির কোঁচাটি দুলিয়ে কেমন খোল খরতাল বাজায় দেখেছেন ত? চোখে না দেখলে দূর থেকে শুনলে খাঁটি কীর্তনের দল বলে ভুল হবে...'

এয়ারলাইনস্ আপিসের পাশেই আওরঙ্গাবাদ হোটেল, পৌঁছতে লাগল মাত্র পনের মিনিট। ছোট হোটেল, তবে থাকার ব্যবস্থা বেশ ভাল। খাতায় নামটাম লিখিয়ে আমরা দুজন গেলাম এগারো নম্বর ঘরে, লালমোহনবাবু চোদ্দয়। ফেলুদা স্যান্টাক্রুজ থেকে একটা বম্বের কাগজ কিনেছিল, রেস্টোরান্টে খাবার সময় ওটা পড়তে দেখেছিলাম। এবার ঘরে এসে চেয়ারে বসে মাঝখানকার একটা পাতায় কাগজটা খুলে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'ভ্যাণ্ডালিজম্ মানে জানিস?' পরিষ্কার না জানলেও, আবছা আবছা জানতাম। গুণ্ডামি ধরনের কোনো ব্যাপার কী? ফেলুদা বলল, 'পঞ্চম শতাব্দীতে যে বর্বর জাতি রোম শহরকে ধ্বংস করেছিল তাদের বলত ভ্যান্ড্‌লস। সেই থেকে ভ্যাণ্ডালিজম বলিতে বোঝায় কোনো সুন্দর জিনিসকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা।'

কথাটা বলে ফেলুদা কাগজটা আমার হাতে দিল। তাতে খবর রয়েছে—'মোর ভ্যাণ্ডালিজম্। তার নিচে বলছে—মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে ত্রিংশ শতাব্দীর কাণ্ডারিয়া মেহাদেও মন্দিরের গা থেকে একটা মেয়ের মূর্তির মাথা কে বা কারা যেন ভেঙে নিয়ে গেছে। বরোদার এক আর্ট স্কুলের চারজন

ছাত্র মন্দিরটা দেখতে গিয়েছিল, তারাই নাকি প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। গত এক মাসে এই নিয়ে নাকি তিনবার এই ধরনের ভ্যাণ্ডালিজমের খবর জানা গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই মূর্তির টুকরোগুলোকে নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে।

আমি খবরটা হজম করার চেষ্টা করছি এমন সময় ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'যদ্দূর মনে হয়—অক্টোপাস একটাই। তার শুঁড়গুলো ভারতবর্ষের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে এ-মন্দির ও-মন্দির থেকে মূর্তি সরাচ্ছে। যে-কোনো একটা শুঁড়কে জখম করতে পারলেই সমস্ত শরীরটা ধড়ফড় করে উঠবে। এই জখম করাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য।'

৫

আওরঙ্গাবাদ ঐতিহাসিক শহর। আবিসিনিয়ার এক ক্রীতদাস —নাম মালিক অম্বর—ভারতবর্ষে এসে তার ভাগ্য ফিরিয়ে ক্রমে আমেদনগরের রাজার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। তিনিই খাড়কে নামে একটা শহরের পত্তন করেন, যেটা আওরঙ্গজেবের আমলে নাম পালটে হয়ে যায় আওরঙ্গবাদ। মোঘল আমলের চিহ্ন ছাড়াও এখানে রয়েছে প্রায় তেরশো বছরের পুরোন আট-দশটা বৌদ্ধ গুহা —যার ভেতরে দেখবার মতো কিছু মূর্তি রয়েছে। যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আজ আলাপ হল, তিনি বিকেলে আমাদের সঙ্গে আরেকটু বেশি ভাব জমাতে আমাদের ঘরে এসেছিলেন। এক সঙ্গে চা খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন, এই সব গুহার মূর্তির সঙ্গে নাকি এলোরার মূর্তির খানিকটা মিল আছে। 'আপনারা কাল যদি সময় পান একবার দেখে আসবেন।' আজ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে; কাল সকালে দিন ভালো থাকলে আমরা সেই গুহাগুলো, আর তার কাছেই আওরঙ্গজেবের রাণীর স্মৃতিস্তম্ভ বিবি-কা-মোক্‌বারা দেখে আসব। আমাদের কাল দুপুরটা পর্যন্ত থাকতেই হবে, কারণ এগারোটার সময় জয়ন্ত মল্লিকের আসার কথা। আমাদের বিশ্বাস তিনি এলোরা যাবেন, এবং আমরা যাবো তাকে ফলো করে।

রাত্রে খাবার পর ফেলুদা তার এলোরার গাইডবুক নিয়ে বসল। আমি কী করি তাই ভাবছি, এমন সময় জটায়ু এসে বললেন, 'কী করছ তপেশবাবু? বাইরে বেশ চাঁদ উঠছে, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নীচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধ হয় বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে ট্র্যানজিসটারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। রাস্তার

উল্টো দিকে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা উঁচিয়ে তর্ক করছে—কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ ভাষাটা বোধ হয় মারাঠী। দিনের বেলায় রাস্তাটায় বেশ লোকজন গাড়িটাড়ির চলাচল ছিল, এখন এই দশটার মধ্যেই সব কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা গেল, একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোত্থেকে জানি একটা লোক 'এ মধুকর—এ মধুকর!' বলে চেঁচিয়ে উঠল—সবই যেন কেমন নতুন নতুন, সব কিছুর মধ্যেই যেন খানিকটা রহস্য, খানিকটা রোমাঞ্চ, খানিকটা অজানা ভয় মেশানো রয়েছে। আর তার মধ্যে লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস্ করে বললেন, 'শুভঙ্কর বোসকে দেখে একটু সাস্‌পিসাশ বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'



বলতে ভুলে গেছি বাঙ্গালী প্রফেসরটিব নাম হল শুভঙ্কর বোস। আমি বললাম, 'কেন?'

'ওর সুটকেসের মধ্যে কী আছে বল ত? পঁয়ত্রিশ কিলো ওজন হয় কি করে?'

'পঁয়ত্রিশ কিলো!'—আমি ত অবাক।

'বম্বেতে প্লেনে ওঠার আগে মাল ওজন করছিল'। আমার সামনেই উনি ছিলেন। আমি দেখেছি। পঁয়ত্রিশ কিলো। যেখানে তোমার দাদারটা বাইশ, তোমারটা চোদ্দ, আমারটা ষোল। ভদ্রলোকের অতিরিক্ত মালের জন্য বেশ কিছু টাকা দিতে হল।'

এ খবরটা আমি জানতাম না। অথচ বাক্সটা বেশি বড় নয় ঠিকই। কী আছে ওটার মধ্যে?

'পাথর!' লালমোহনবাবু নিজেই ফিস্‌ফিস করে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন।—'কিম্বা পাথর ভাঙার জন্য লোহার সব যন্ত্রপাতি। তোমার দাদা বলছিলেন না—এই সব মূর্তি চুরির পেছনে একটা দল আছে? আমি বলছি উনি সেই দলের একজন। ওর নাকটা দেখেছ? ঠিক ঘনশ্যাম কর্কটের মতো।'

'ঘনশ্যাম কর্কট? সে আবার কে?'

'ও হো—তোমাকে বলা হয় নি। আমার নতুন গল্পের ভিলেন। তার নাকের বর্ণনা কিরকম দোব জান ত? পাশ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন

জলের উপর বেরিয়ে থাকা হাঙরের ডানা। জটায়ু আমার মাথাটা গণ্ডগোল করে দিলেন। আমার কিন্তু শুভঙ্কর বোসকে একটুও সন্দেহ হয় নি। কারণ যে লোক আর্ট সম্বন্ধে এত জানেন....। অবিশ্যি এখন ভাবলে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের নাম-করা মন্দিরগুলো থেকে যারা মূর্তি চুরি করবে তাদেরও ত আর্ট সম্বন্ধে কিছুটা জানতে হবে। ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে সত্যিই একটা ধারালো ভাব আছে।

'তোমায় বলে দিলুম', লালমোহনবাবু বললেন, 'এবার থেকে খালি একটু চোখে চোখে রেখ। আমাকে আজকে একটা ল্যাবেঞ্চুস অফার করেচিলেন, নিলুম না। যদি বিষ-টিষ মেশানো থাকে! তোমার দাদাকে বোল ওঁর নিজের পরিচয়টা যেন গোপন রাখেন। উনি যে ডিটেকটিভ সেটা জানতে পারলে কিন্তু....'

রাত্রে ফেলুদাকে শুভঙ্কর বোসের বাক্সের ওজনের কথাটা বলাতে ও বলল, 'পঁয়ত্রিশ নয়, সাঁইত্রিশ কিলো। জটায়ুকে বলে দিস যে শুধু পাথরেরই ওজন হয় না, বইয়েরও হয়। আমার বিশ্বাস লোকটা পড়াশুনো করার জন্য সঙ্গে অনেক বই এনেছে।'

পরদিন সকালে সাড়ে ছটায় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এখানকার 'নকল তাজমহল' বিবি-কা মোক্‌বারা দেখে তাবপর বৌদ্ধ গুহা দেখতে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে তারপর গুহায় পৌঁছানো যায়। আমাদের সঙ্গে শুভঙ্কর বোসও রয়েছেন, সমানে আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে চলেছেন, তার অর্ধেক কথা আমার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাকি কথা কোনো কানেই ঢুকছে না। লোকটাকে অনেক চেষ্টা করেও চোর-বদমাইস হিসাবে ভাবতে পারছি না, যদিও লালমোহনবাবু বার বার আড়চোখে তাকে দেখছেন, আর তার ফলে সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছেন।

আমরা ছাড়া আরো দুজন লোক আমাদের আগেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছেন। তার মধ্যে একজন রঙচঙে হাওয়াইয়ান সার্ট পরা এক টেকো সাহেব, আর আরেকজন নিশ্চয়ই টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের মাইনে করা গাইড।

ফেলুদা তার নকশা করা ঝোলাটা থেকে তার পেনট্যাক্স ক্যামেরাটা বার করে মাঝে মাঝে ছবি তুলছে, কখনো পাহাড়ের উপর থেকে শহরের ছবি, কখনো বা আমাদের ছবি। আমাদের দিকে ক্যামেরা তাগ করলেই লালমোহনবাবু থেমে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে পোজ

দিচ্ছেন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে হাঁটা অবস্থাতেও ছবি ওঠে, আর না-হাসলে অনেক সময় ছবি আরো বেশি ভালো ওঠে।

গুহার মুখে পৌঁছে ফেলুদা বলল, 'তোরা দ্যাখ্—আমি ক'টা ছবি তুলে আসছি। শুভঙ্করবাবু বললেন, 'দু' নম্বর আর সাত নম্বরটা মিস্ করবেন না। এক থেকে পাঁচ এই কাছাকাছির মধ্যেই পাবেন, আর ছয় থেকে নয় হল এখান থেকে হাফ-এ-মাইল পূব দিকে। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা পাবেন।'

একে জুন মাস, তার উপর ঝলমলে রোদ, তাই বাইরেটা বেশ গরম লাগছিল। কিন্তু গুহার ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ ঠাণ্ডা। এক নম্বরটায় বিশেষ কিছু নেই, আর দেখেই বোঝা যায় সেটার কাজ অর্ধেক করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর যেটুকু তৈরি ছিল তারও খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে। শুভঙ্করবাবু তাও ভারি আগ্রহের সঙ্গে বারান্দার থাম, সীলিং ইত্যাদি দেখে খাতায় কি সব নোট করে নিতে লাগলেন। আমি আর লালমোহনবাবু দু' নম্বর গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। ফেলুদা আমার সঙ্গে একটা টর্চ দিয়ে দিয়েছিল, বারান্দা পেরিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে জ্বালতে হল। বেশ বড় একটা হল ঘর, তার শেষ মাথায় একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি। দু'পাশের দেয়ালে টর্চ ফেলে দেখি সেগুলোতেও চমৎকার সব মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন, 'তখনকার আর্টিস্টদের শুধু আর্টিস্ট হলে চলত না, বুঝলে হে তপেশ, সেই সঙ্গে গায়ের জোরও থাকতে হত। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে পাহাড়ের গায়ের পাথর ভেঙে তৈরি করতে হয়েছে এসব মূর্তি—চাট্টিখানি কথা নয়।'

তিন নম্বরের ভিতরে ঢুকে দেখি আরো বড় একটা হল ঘর, আর সে ঘর সেই গাইডের বকবকানিতে এমন গম গম করছে যে সেখানে টেকা দায়। বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'তোমার দাদা গেলেন কোথায়? তাকে ত দেখছি না।'

সত্যিই ত। ফেলুদা কোথায় গিয়ে ছবি তুলছে?

আর শুভঙ্করবাবুই বা কোথায়?

'চলো, এগিয়ে চলো', বললেন লালমোহনবাবু।

পাশেই পর পর চার আর পাঁচ নম্বর গুহা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা না থাকায় কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে। কাছাকাছির মধ্যে কোথাও নেই আন্দাজ করে আমরা পূব দিকের গুহাগুলোর পথ ধরলাম। প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হবে, কিন্তু যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার চেয়ে পাথর আর ঝোপঝাড়ই বেশি। ঘড়িতে মাত্র সোয়া আটটা, তাই রোদের

তেজ এখনো তেমন বেশি নয়। দশটার বেশি দেরি করা চলবে না, কারণ এগারোটার গাড়িতে জয়ন্ত মল্লিক আসবেন।

মিনিট পনের হাঁটার পর রাস্তা থেকে কিছুটা উপর দিকে একটা গুহা দেখতে পেলাম। এটা বোধ হয় ছ' নম্বর। পথে ফেলুদার কোনো চিহ্ন দেখতে পাই নি। লালমোহনবাবু গোয়েন্দার ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়ে পায়ের ছাপ খোঁজার বৃথা চেষ্টা করছেন। এ ধরনের পাহাড়ে পথে এমনিতেই বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, তার উপরে সকাল থেকে এক টানা দু' ঘণ্টা রোদ হয়ে রয়েছে। রাস্তা একেবারে শুকনো খট্‌খটে।

আর এগোনোর কোনো মানে আছে কি? তার চেয়ে ওর নাম ধরে ডাকলে কেমন হয়?

'ফেলুদা! ফেলুদা!'

'প্রদোষবাবু! ফেলুবাবু—! ও মিস্টার মিত্তি—র!'

কোনো উত্তর নেই।

আমার পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ওপর দিকে কোথাও চলে গেল নাকি? কোনো কিছুর সন্ধান পেয়েছে কি? জরুরী কিছু? —যার ফলে আমাদের কথা ভুলে গিয়ে তদন্তের কাজে লেগে যেতে হয়েছে?

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'এদিকে নেই। থাকলে ডাক শুনতে পেতেন। নিশ্চয়ই ওদিকেই আছেন। চলো ফিরে চলো। এবার দেখা পাব নির্ঘাৎ দাদা ত আর খামখেয়ালী নন, বা কাঁচা কাজ করার লোক নন। চলো।'

আমরা উল্টোমুখে ঘুরলাম। কিছু দূর গিয়েই সেই সাহেব আর তার গাইডের সঙ্গে দেখা হল। এরা এক থেকে পাঁচ শেষ করে ছ'য়ের দিকে চলেছে। বেশ বুঝলাম গাইডের কথার ঠেলায় সাহেবের অবস্থা কাহিল।

'ওই ত শুভঙ্করবাবু!' লালমোহনবাবু বলে উঠলেন। ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। জটায়ুর গলা শুনে মুখ তুললেন। আমি ব্যস্তভাবে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আমার দাদাকে দেখেছেন কি?'

'কই না ত। উনি যে বললেন, ছবি তুলতে যাবেন?'

'কিন্তু ওকে ত দেখছি না। আপনি গুহাগুলো—?'

'কেভের মধ্যে নেই। আমি সবগুলো দেখে আসছি।'

আমার ভয় ভয় ভাব দেখেই বোধ হয় ভদ্রলোক সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, 'কোথায় আর যাবেন—পাহাড়ের ওপর দিকে কোথাও গেছেন

হয়ত। শহরটার একটা ভালো ভিউ পাওয়া যায় ওপর থেকে। একটু এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাক দাও—ঠিক শুনতে পাবেন।'

শুভঙ্কর বোস ছ' নম্বর কেভের দিকে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বললেন, 'গতিক ভালো লাগছে না তপেশ। এলোরা না যেতেই একটা চিন্তার কারণ ঘটবে এটা ভাবি নি।'

মনে সাহস আনার চেষ্টা করে এগিয়ে চললাম। হাঁটার স্পীড আপনা থেকেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে সময়ের ভীষণ দাম, এগারটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, মল্লিক এলো কিনা জানতে হবে। অথচ ফেলুদাই বেপাত্তা। ফেলুদা ছাড়া....ফেলুদা ছাড়া....

'চারমিনার'—লালমোহনবাবুর হঠাৎ-চীৎকারে চমকে লাফিয়ে উঠলাম।



সামনেই পাঁচ নম্বর গুহার থামগুলো দেখা যাচ্ছে। তার বাইরে একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে একটা হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে। যাবার সময় সেটা হয় ছিল না, না হয় চোখে পড়েনি। খালি প্যাকেট কি? নাকি সিগারেট থাকা অবস্থায় পকেট থেকে পড়ে গেছে? কিম্বা হাত থেকে?....

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে তুললাম। খুলে দেখি খালি। ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় 'দেখি দেখি বলে লালমোহনবাবু সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরো বেশি করে খুলতেই ভিতরের সাদা কাগজের গায়ে একটা ডট পেনের লেখা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদার হাতের লেখা—

'হোটেলে ফিরে যা।'

যদিও ফেলুদার একটা চিহ্ন পেয়ে হাঁপ ছাড়ার একটা কারণ হল, কিন্তু কী কারণে কী অবস্থায় সেটা লিখতে হয়েছে না জেনে পেটের ভিতরে খালি ভাবটা পুরোপুরি গেল না। লালমোহনবাবু বললেন, 'তা না হয় হোটেলে ফিরে গেলুম, কিন্তু মিস্টার বোসের কী হবে? তাঁর ত আরো চারটে গুহা দেখতে বাকি!'

আমি বললাম, 'এক কাজ করি—আমরা ফিরে গিয়ে ট্যাক্সিটা ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

'এখানে থেকে ওঁর গতিবিধি একটু লক্ষ্য করলে হত না?

'মিস্টার বোসের?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কিন্তু মনে হয় ফেলুদার আদেশ মানা উচিত।'

'তবে চলো যাই হোটেলে ফিরে।'

লালমোহনবাবু নিজে রহস্যের গল্প লেখেন বলেই বোধহয় মাঝে মাঝে ওঁর গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক চাপে। বেশ বুঝতে পারছিলাম উনি শুভঙ্করবাবুকে ফলো করতে চাচ্ছেন, কিন্তু বাধ্য হয়েই বাধা দিতে হল। ট্যাক্সি আমাদের দুজনকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আবার গুহায় ফিরে গেল। এখন মাত্র ন'টা। এইভাবে ফেলুদার অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না।

ঘরে থাকতে ভালো লাগছিল না, তাই দুজনে হোটেলের বাইরে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম। সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন আবার মেঘ করে আসছে। এক হিসেবে ভালো। গরমটা কমবে।

পৌনে দশটা নাগাদ শুভঙ্করবাবু ফিরে এসে ফেলুদা তখনও আসেনি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন। অথচ আমরা যে একটা ক্রাইমের তদন্ত করতে এসেছি, বিপদের আশঙ্কা আছে, এটাও ওঁকে বলা যায় না, কারণ এখনো সেরকম আলাপ হয়নি, আর লালমোহনবাবুর এখনো বিশ্বাস উনি শত্রুপক্ষের লোক। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই এটা বোঝানোর জন্য বললাম, 'ও ওইরকমই লোক। ভীষণ ভুলো আর খামখেয়ালি। আগেও অনেক বার এরকম করেছে।'

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় পায়চারি করে ঘরে ফিরে এসে টিনটিনের বইটা খুলে তুষার মানবের রোমাঞ্চকর ঘটনায় মন দিতে চেষ্টা করলাম। এগারোটার কিছু পরে একবার মনে হল যেন একটা ট্রেনের হুইস্‌ল শুনতে পেলাম। গিয়ে দেখি ট্যাক্সি থেকে দুজন ভদ্রলোক নামলেন। একজন মাঝারি হাইট, কাঁধ চওড়া, ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা, দেখেই কেন জানি মনে হয় কড়া সাহেবী মেজাজের লোক। অন্যজন লম্বা, বেলবটম প্যাণ্ট, ফুলকারী করা পাতলা সার্ট, গলায় চেন, লম্বা চুল, এলোমেলো গোঁফ দাড়ি। এরা দুজন ট্যাক্সি শেয়ার করে এসেছেন, এক জোটে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। লম্বার সঙ্গে একটা নতুন ক্যানভাসের ব্যাগ, আর ঘাড়ে-গর্দানের সঙ্গে পুরোনো চামড়ার সুটকেস। মাল নিয়ে দুজনে হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ট্যাক্সি এসে পড়ল।

দরজা খুলে নামলেন জয়ন্ত মল্লিক।

তাকে দেখে যতটা নিশ্চিন্ত হলাম, তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ফেলুদার কাণ্ড দেখে।

এরকম অবস্থায় কি এর আগে পড়েছি কখনো? মনে ত পড়ে না।

৬

আরো দশ মিনিট ফেলুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় অগত্যা হোটেলে ফিরে গিয়ে লালমোহনবাবুর ঘরের দরজায় টোকা মারলাম। উনি দরজা খুলেই চোখ গোল করে বললেন, 'আমি এতক্ষণ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দারুণ সাস্‌পিশাস সব লোকেরা এসে পড়েছে। এরা সবাই কি এলোরা যাবে নাকি? একটা ত একেবারে হিপি না হিপো না কী বলে ঠিক সেইরকম; নির্ঘাৎ গাঁজা-টাজা খায়। লম্বা চুল, এলোপাথাড়ি দাড়ি গোঁফ।'

আমি জানি লালমোহনবাবু কার কথা বলছেন। আমি বললাম, 'মিস্টার মল্লিকও এসে গেছেন।'

'বটে? কিরকম দেখতে বল ত?'

আমি বর্ণনা দিতেই ভদ্রলোক বললেন, 'লোকটা আমার পাশের ঘরে রয়েছে। আমি দেখেই ডাউট করেছিলুম, কারণ ওর সুটকেসটা বইতে হোটেলের বেয়ারার কাঁধ বেঁকে গেল। ওর মধ্যেই ত যক্ষীর মাথাটা রয়েছে?'

আমি ফেলুদার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না, তাই বললাম, যক্ষীর মাথার চেয়েও দরকার ফেলুদার সন্ধান পাওয়া। এলোরায় যাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। অথচ মল্লিক নিশ্চয়ই বসে থাকার জন্য আসেনি। আমরা যাবার আগে সে যদি গিয়ে আরেকটা মূর্তি-টূর্তি ভেঙে—'

'ওটা কী?'

লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্নটা করে আমার কথা থামিয়ে দিলেন। তিনি চেয়ে আছেন দরজার দিকে। আমি ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি তার তলা দিয়ে কে যেন একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এক লাফে গিয়ে কাগজটা তুলে ভাঁজ খুললাম। তিন লাইনের চিঠি। ফেলুদার হাতের লেখা—

'দেড়টার সময় সব মাল নিয়ে দুজনে হোটেলের বাইরে গিয়ে পাঁচশো বিশ নম্বর কালো অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করবি। লাঞ্চ সেরে নিস। হোটেলের ভাড়া অ্যাডভান্স দেওয়া আছে।'

চিঠিটা পড়েই দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই পাশের ঘর থেকে মল্লিক বেরিয়ে ব্যস্তভাবে আপিসের দিকে চলে গেল। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, কিন্তু মনে হল না যে ভদ্রলোক চিনতে পেরেছেন।

'ঘর খালি। দরজা খোলা। একবার যাব নাকি! যক্ষীর মাথাটা যদি....'

লালমোহনবাবুর সাহস বড্ড বেড়ে গেছে। বললাম, 'একটা বাজে। আমার মনে হয় আপনার তৈরি হয়ে নেওয়া উচিত। আমিও যাই।'

একটা পঁচিশে লাঞ্চ সেরে ফেলুদার সুটকেশ সমেত আমাদের মাল নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লালমোহনবাবু এই ফাঁকে রাস্তার উল্টো দিকের একটা দোকান থেকে পান কিনে আনলেন। মিঠে পান পাওয়া যায় না; এ হল সাদা মগাই পান। কলকাতায় কক্ষনো খাই না, কিন্তু এখানে দিব্যি লাগছে।

একটা ট্যাক্সি এল। কালো নয়, সবুজ। নম্বরও মিলছে না। ড্রাইভারটা বাইরে বেরিয়ে হাত দুটোকে মাথার ওপর তুলে আড় ভাঙল।

তিন মিনিট পরে আরেকটা ট্যাক্সি। কালো অ্যাম্বাসাডর। নম্বর পাঁচশো ত্রিশ। আমরা দুজনে মাল নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

'মিস্টার মিটারকা পার্টি?' পাঞ্জাবী ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' জটায়ু বেশ ভারিক্কি চালে হিন্দি মেজাজে উত্তর দিলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনটা খুলে দিল, সুটকেস তিনটে ভিতরে চলে গেল।

হোটেল থেকে লোক বেরোচ্ছে। মিস্টার মল্লিক আর শুভঙ্কর বোস। এদের একটু আগেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেতে দেখেছি। সবুজ ট্যাক্সিতে উঠলেন দুজন। ট্যাক্সিটা দুবার গোঁ গোঁ করে স্টার্ট নিয়ে আদালত রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিল। এলোরা যেতে হলে ওই দিকেই যেতে হয়।

সাসপেন্সে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে ফেলুদার উপর যে একটু রাগও হচ্ছিল না তা নয়। অথচ মন বলেছে ফেলুদা খামখেয়ালী লোক নয়, যা করে তা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা ক'রে করে।

আবার লোক। এবার সেই দিশি হিপি, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ। সোজা আমার দিকে এসে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়্!'

কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম প্রায় ম্যাজিকের মতো আমি গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছি, সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে হিপি তাকেও গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল, আর নিজে এসে আমার পাশে ধপ করে বসে দরজাটা এক টানে বন্ধ করে বলল, 'চলিয়ে দীনদয়ালজী।'

ফেলুদা ভালো মেক আপ করতে পারে জানি, কিন্তু এমন আশ্চর্য রকম ভালো পারে, গলার স্বর হাঁটা চলা চোখের চাহনি—সব কিছু এমনভাবে পালটাতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। লালমোহনবাবু অবিশ্যি এর

মধ্যেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে ফেলুদার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছেন। চমক লাগার ফলে বুক ধড়ফড়ানির সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনাটাও জানতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ফেলুদা মুখ খুলল একেবারে শহর ছাড়িয়ে খোলা রাস্তায় পড়ে।

'সেই বারাসাতের কারখানায় মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; ও যদি দেখত সেই একই লোক তার সঙ্গে এলোরা যাচ্ছে তা হলে গণ্ডগোল হয়ে যেত। তাই এই মেকআপ। তোদের বলিনি, কারণ তোরা দেখি চিনতে পারিস কিনা সেটা জানা দরকার ছিল। পারলি না, কাজেই নিশ্চিন্ত হলাম।

'ঝোলার মধ্যে সব ছিল; ছবি তোলার নাম করে ছ' নম্বর কেভে চলে যাই। ওটা একটু ওপর দিকে বলে বিশেষ কেউ যায় না। মেক-আপ হলে পর সেই অবস্থায় হেঁটে শহরে ফিরে আসি। প্রথমে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করি, তারপর স্টেশনে গিয়ে মনমডের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করি। মল্লিককে নামতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে ফলো করে ওর পিছনের ট্যাক্সিটায় উঠি। আরেকজন আসছিল হোটেলে, তাকে সঙ্গে তুলে নিই ভাড়াটা শেয়ার করতে পারব বলে।..... শুভঙ্কর বোস জিগ্যেস করলে বলিস দাদা একটা বিশেষ কাজে বম্বে চলে গেছে, কারণ এই মেক-আপ কেবল রাত্রে শোবার আগে ছাড়া খোলা যাবে না। তোতে আমাতে আলাপ আছে এটা জানলেও মুশকিল। তুই আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে এসেছিস, আমি আলাদা। তোরা এক ঘরে থাকবি, আমি আলাদা ঘরে।'

'তুমি বাঙালি তো?' —'আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম। ফেলুদার সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলতে হবে ভাবতে ভালো লাগছিল না।

'বাংলা জানি এটুকু বলে রাখছি। নাম জানার দরকার নেই। পেশা ফটোগ্রাফি; হংকং-এর এশিয়া ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তুলতে এসেছি।'

'আর আমরা?'

'মামা-ভাগনে। উনি সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তুই সিটি স্কুলের ছাত্র। ছবি আঁকার শখ আছে। সামনের বছরে কলেজে ঢুকবি। ইতিহাসে অনার্স নিবি। তোর পদবী মুখার্জি। লালমোহনবাবুর নাম চেঞ্জ হচ্ছে না। আপনি এলোরা সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে নেবেন। মোটামুটি মনে রাখবেন যে, কৈলাসের মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা কৃষ্ণের আমলে।'

লালমোহনবাবু কথাটা বিড়বিড় করে আওড়ে নিয়ে চলন্ত গাড়িতেই কোনোমতে তাঁর খাতায় নোট করে নিলেন। ভীষণ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে

ফেলুদা আমাদের উপর। এখন বুঝতে পারছি ফেলুদা কেন নিজে গরজ করে লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নিতে চাইছিল। ও জানত যে মল্লিকের সন্দেহ এড়াবার জন্য ওকে ছদ্মবেশ নিতে হবে, আমার থেকে আলাদা থাকতে হবে। লালমোহনবাবু থাকলে দলটা ভারিও হবে, আর আমার একজন অভিভাবকও হবে। লালমোহনবাবুকে মামা বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফেলুদাকে ভালো করে চিনি না—এটা বোঝাতে গেলে সত্যিই অ্যাকটিং করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?

আওরঙ্গবাদ থেকে এলোরার রাস্তা চমৎকার। দূরে পাহাড়—যদিও বেশি উঁচু না—আর রাস্তার দু-পাশে রুক্ষ জমি। একটা নতুন ধরনের মনসার ঝোপ দেখতে পাচ্ছি যেটা ফণিমনসা নয়। রাজস্থানেও এরকম লম্বা লম্বা মনসার পাতা দেখেছি। এর এক একটা ঝোপ প্রায় দেড় মানুষ উঁচু।

পিছনে কিছুক্ষণ থেকেই একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল, আমাদের ড্রাইভার সিগন্যাল করাতে সেটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তাতে রয়েছে সেই টেকো সাহেব, আর ফেলুদার সঙ্গে যে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল সেই ঘাড়ে-গর্দানে লোকটা।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাহাড় ক্রমে কাছে এগিয়ে এল। রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁষে খানিকটা উপর দিকে উঠে, ডান দিকে পাহাড়টাকে রেখে এগোতে লাগল। বাঁ দিকে দূরে একটা ছোট্ট শহরের মতো দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার বলল সেটা খুলদাবাদ, আর খুলদাবাদেই নাকি এলোরার গুহা। আমরা ডাক বাংলোতে থাকব। অন্য সময় হলে হয়ত এত চট করে জায়গা পাওয়া যেত না, কিন্তু আগেই বলেছি এটা অফ-সীজন; তার মানে টুরিস্টদের সংখ্যা কম। আর সেই কারণেই অবিশ্যি মূর্তি-চোরদেরও সুবিধে।

আরো খানিকটা যেতেই ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে প্রথম গুহাগুলো দেখতে পেলাম। ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'পহিলে কেভ দেখ্না, ইয়া বাংলোমে যানা?'

ফেলুদা বলল, 'পহিলে বাংলো।'

বাঁ দিক দিয়ে একটা রাস্তা খুলদাবাদের দিকে চলে গেছে। গাড়ি সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেল। আমি তখনও অবাক হয়ে পাহাড়ের গা থেকে কেটে কেটে বাঁর করা সারি সারি গুহাগুলোর দিকে দেখছি। এর মধ্যে কৈলাস কোন্টা কে জানে!

খুলদাবাদে দুটো থাকার জায়গা আছে—একটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস—সেটা ভাড়া বেশি—আর একটা ডাক বাংলো। আমরা বাংলোতেই দুটো ঘর

বুক করেছি। যাবার পথে আগে গেস্ট হাউসটা পড়ে। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সামনের বাগানের পাশে সবুজ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে জয়ন্ত মল্লিক এটাতেই উঠেছেন। গেস্ট হাউসের পরের বাড়িটাই বাংলো, দুটোর মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা। সাইজে বাংলোটা অনেক ছোট, বাহারও কম, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফেলুদা ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বলল সে যেন মিনিট পনের অপেক্ষা করে। আমরা জিনিসপত্র রেখে কৈলাসে যাব, ও আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গবাদ ফিরে যাবে।

ডাক বাংলোয় সবসুদ্ধ চারটে ঘর, প্রত্যেকটায় তিনটে করে খাট। ফেলুদা ইচ্ছে করলে আমাদের ঘরে থাকতে পারত, কিন্তু থাকল না। ও নিজের ঘরে যাবার সময় চাপা গলায় বলে গেল, 'তোর পদবী মুখার্জি, লালমোহনবাবু তোর মেজোমামা, রাষ্ট্রকুট, সেভেন্‌থ সেনচুরি রাজার নাম কৃষ্ণ....আমি দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

আমাদের ছেড়ে ফেলুদা তার নিজের ঘরে গিয়েই 'চৌকিদার' বলে হাঁক দিল এমন একটা গলায় যার সঙ্গে ওর নিজের গলার কোনো মিল নেই।

আমরা দুজনে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝখানের ডাইনিং রুমটায় এসে বুঝতে পারলাম যে আরেকজন লোক বাংলোয় এসে উঠেছেন। ইনিই ফেলুদার সঙ্গে স্টেশন থেকে এসেছিলেন, আর একেই আমরা একটু আগে ট্যাক্সিতে সেই সাহেবটার সঙ্গে দেখেছি। তখন দেখে বক্সার বা কুস্তিগীর বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি চোখের কোণে একটা বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল হাসি হাসি ভাব রয়েছে, যাতে মনে হয় ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া জানেন—এমন কি হয়ত কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী-টিল্পীও হতে পারেন। আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, 'বেঙ্গলী?'

'ইয়েস স্যার', লালমোহনবাবু জবাব দিলেন। —'ফ্রম ক্যালকাটা। আই অ্যাম দি কি বলে প্রোফেসর অফ হিস্ট্রি ইন দি সিটি কলেজ। অ্যাণ্ড দিস ইজ কি বলে মাই নেফিউ।'

'কৈলাস দেখতে আসা হয়েছে?' —পরিষ্কার বাংলায় বললেন ভদ্রলোক।

'হো হো—আপনিও বাঙালী?'

'একশো বার। তবে কলকাতার নয়। এলাহাবাদের।'

ভদ্রলোকের বাংলায় একটা টান আছে যেটা অনেক প্রবাসী বাঙালীর মধ্যেই থাকে।

আমাদের আর কিছু না বললেও চলত, কিন্তু ইংরিজি বলতে হবে না জেনে বোধ হয় খুশি হয়েই লালমোহনবাবু আরো একগাদা কথা বলে ফেললেন।

'ভাবলুম রাষ্ট্রপুট বংশের অতুল কীর্তিটা একবার দেখে আসি, হেঁ হেঁ। আমার ভাগ্নেটির আবার আর্টের দিকে খুব ইয়ে। বলছে বি এ পড়ে আর্ট কলেজে ঢুকবে। দিব্যি ছবি আঁকে। ভূতো, তোমার ড্রইং-এর খাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে নিও!'

আমি চুপ করে রইলাম, কারণ ড্রইং-এর খাতা আমি আনিনি।

ফেলুদাও এই ফাঁকে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ক্যামেরাটা বাইরে বের করে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে, কারণ ছবি তাকে তুলতেই হবে। আমাদের তিনজনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে তার নতুন গলায় নতুন উচ্চারণে বলল, 'আপনাদের যদি কেভ দেখার ইচ্ছে থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে পারেন। ট্যাক্সিটা এখনো রয়েছে।'

'বাঃ—খুব সুবিধেই হল!' লালমোহনবাবু বললেন। — 'আপনি যাবেন নাকি ওদিকে?'

প্রশ্নটা করা হল এলাহাবাদের বাবুটিকে। বাবু বললেন, 'আমি পরে যাব। আই মাস্ট হ্যাভ এ বাথ ফার্স্ট।'

বাইরে এসেই লালমোহনবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'আরো কিছু ছাড়ুন মশাই। ইতিহাসের স্টকটা আরেকটু না বাড়ালে চলছে না।'

ফেলুদা বলল, 'ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পিরিয়ডগুলোর নাম জানা আছে আপনার?'

'তার মানে?'

'এই যেমন মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, কুষাণ, চোল—বা এদিকে পাল বংশ, সেন বংশ—এগুলো জানেন?'

লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, 'একটা কথা বলব মশাই? —এমনও তো হতে পারে যে আমি কানে খাটো। কেউ কথা বললে যদি ঠিকমতো না শোনার ভান করি তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'আপত্তি নেই—যদি অভিনয়টা ঠিক হয়, আর যদি সেটা মেনটেন করে যেতে পারেন।'

'সেটা মশাই ইতিহাস-আওড়ানোর চেয়ে ঢের সহজ। দেখলেন তো কুট বলতে পুট বেরিয়ে গেল।'

গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম জয়ন্ত মল্লিক বাইরে বেরিয়ে এসে পকেটে হাত দিয়ে বাংলোর দিকে চেয়ে আছে, আর সবুজ ট্যাক্সিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা যেন মল্লিককে দেখেই তার ঝোলাটায় হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট চিরুনি বার করে আমায় দিয়ে বলল, 'সিঁথিটা ডান দিকে করে নে তো; পোর্ট্রেটটা একটু চেঞ্জ হবে।' উইণ্ডস্ক্রীনের আয়নায় দেখে চুলটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলাম। শুধু সিঁথির এদিক ওদিকেই যে মানুষের চেহারা এতটা বদলে যায় সেটা আমার ধারণা ছিল না।

বাংলোয় যাবার রাস্তাটা যেখানে এসে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে খানিকটা গিয়েই সামনে বিখ্যাত কৈলাসের মন্দির। ফেলুদা বলেই দিয়েছিল যে আজ আর বেশি ঘোরা হবে না, কারণ কৈলাস দেখতে দেখতেই আলো পড়ে যাবে। ট্যাক্সি আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ চলে গেল।

কৈলাস যে কী ব্যাপার সেটা বাইরে থেকে তেমন বুঝতে পারিনি। সামনের প্রকাণ্ড পাথরের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই হঠাৎ যেন মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল। মূর্তিচোর, যক্ষীর মাথা, মিস্টার মল্লিক, শুভঙ্কর বোস—সব যেন ধোঁয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শুধু রইল একটা চোখ-ট্যারানো মন-ধাঁধানো অবাক হওয়ার ভাব। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, তেরশো বছর আগে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের একদল কারিগর পাহাড়ের গা কেটে এই মন্দির বার করেছে; কিন্তু পারলাম না। এ মন্দির যেন চিরকালই ছিল; কিম্বা কোনো আদ্যিকালের যাদুকর কোনো আশ্চর্য মন্ত্রবলে এক সেকেন্ডে এটা তৈরি করেছে; কিম্বা ফেলুদার সেই বইটাতে যেমন আছে—হয়ত মানুষের চেয়েও অনেক বেশী জ্ঞানীগুণী কোনো প্রাণী অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসে এটা তৈরি করে দিয়ে গেছে।

তিন দিকে পাহাড়ের দেয়ালের মাঝখানে কৈলাসের মন্দির। মন্দিরের এক পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে অন্য দিক দিয়ে আবার সামনে ফিরে আসা যায়। এই রাস্তা বা প্যাসেজ কোনোখানেই আট দশ হাতের বেশি চওড়া না। মন্দিরের ডাইনে আর বাঁয়ে পাহাড়ের অনেকগুলো গুহার মতো ঘর করা আছে, আর তার মধ্যেও অনেক মূর্তি রয়েছে।

আমরা ডান দিকের প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, আর ফেলুদা বিড়বিড় করে ইনফরমেশন দিয়ে চলেছে—

'জায়গাটা তিনশো ফুট লম্বা, দেড়শো ফুট চওড়া....মন্দিরের হাইট একশো ফুট....দু লক্ষ টন পাথর কেটে সরানো হয়েছিল.... প্রথমে তিন দিকে পাথর কেটে খাদ তৈরি করে তারপর চূড়ো থেকে শুরু করে কাটতে কাটতে নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছিল.... দেবদেবী মানুষ জানোয়ার রামায়ণ মহাভারত কিছুই বাদ নেই এখানে। ক্যালকুলেশনের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ....আর্ট ছেড়ে দিয়ে শুধু এঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকটা দ্যাখ্....'

ফেলুদা আরো বলত, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে থেমে আমাদের দুজনের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে গিয়ে একটা গহ্বরের মধ্যে রাবণের কৈলাস নাড়াব মূর্তিটা দেখতে লাগল।

পায়ের শব্দ। মন্দিরের পিছন থেকে শুভঙ্কর বোস বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবুক, কাঁধে একটা ঝোলা। ভারি মন দিয়ে মন্দিরের কারুকার্যগুলো দেখছেন তিনি। এবার মূর্তি ছেড়ে আমাদের দুজনের দিকে এলো তাঁর দৃষ্টি। প্রথমে একটা হাসি তারপরেই একটা উদ্বেগের ভাব।

'তোমার দাদার কোনো খবর পেলে না?'

যতদূর পারি স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'উনি একটা জরুরী কাজে হঠাৎ বম্বে চলে গেছেন। আজকালের মধ্যেই ফিরবেন।।'

'ও....'

শুভঙ্কর বোসের চোখ আবার পাথরের দিকে চলে গেল। পিছনে একটা খচ্ শব্দ পেয়ে বুঝলাম ফেলুদা একটা ছবি তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফেলুদা আবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দুজন মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে উল্টো দিকে গিয়ে পড়লাম। এবার আরেকজন লোককে দেখতে পেলাম। গায়ে নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট। মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক। ইনি সবেমাত্র এসে ঢুকেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদের দেখেই মন্দিরের দেয়ালে একটা হাতি মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। এর হাতের ব্যাগটা কলকাতাতেও দেখেছি। বারাসত থেকে ফেরার পথে এই ব্যাগ তার গাড়িতে ছিল, এই ব্যাগ নিয়ে উনি কুঈনস ম্যানসনে নেমেছিলেন। ওটাতে কী আছে জানবার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল হল। ফেলুদা আমাদের কাছাকাছি এসে গেছে। এক এক সময় ইচ্ছে করছিল ফেলুদা সোজা গিয়ে মল্লিকের কলারটা চেপে ধরে বলুক—'কই, বার করুন মশাই যক্ষীর মাথা!—কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে ও ও-রকম কাঁচা কাজ করবে না। মল্লিক সিদিকপুরে গিয়েছিল সেটা ঠিক; এখন এলোরায় এসেছে সেটা ঠিক, আর বম্বেতে কাকে জানি ফোন

করে বলেছিল, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে—সেটাও ঠিক। কিন্তু এর বেশি কিছু ওর সম্বন্ধে এখনো জানা যায়নি। আরেকটু না জেনে, আরেকটু প্রমাণ না পেয়ে ফেলুদা কিছু করবে না।

যেটা এখনই করা যায় সেটা অবিশ্যি ফেলুদা করল। মল্লিকের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের শরীর দিয়ে ভদ্রলোকের ব্যাগটায় একটা ধাক্কা দিয়ে 'সরি' বলে একটা মূর্তির দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফোকাস করতে লাগল।

ধাক্কা খেয়ে ব্যাগটা নড়বড় করে উঠল, তাতে মনে হল না তার ভিতরে কোনো ভারি জিনিস রয়েছে।

কৈলাস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোককে দেখতে পেলাম। একজন আমাদের বাংলোর এলাহাবাদী বাবু, আরেকজন হলেন সেই টেকো সাহেব। বাবু হাত নেড়ে কথা বলছেন, সাহেব মাথা নেড়ে শুনছেন। হঠাৎ কেন জানি মনে হল—আমরা তিনজন ছাড়া যত জন লোক এখানে এসেছে সবাই গোলমেলে, সবাইকেই সন্দেহ করা উচিত। ফেলুদাও কি তাই করছে?

৭

কৈলাস থেকে ফেরার পথে ফেলুদার হঠাৎ কেন জানি গেস্ট হাউসে যাবার ইচ্ছে হল। কারণ জিগ্যেস করতে বলল, 'একবার খোঁজ করে আসি এখানে খবরের কাগজ আসে কি না ।' আমরা বাংলোয় চলে গেলাম। আমাদের দুজনেরই খিদে পাচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবু চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে চা আর বিস্কুট অর্ডার দিলেন। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনিং রুম। তার ডান দিকের এক নম্বরের ঘরটা আমাদের। আমাদের পরের ঘরটা দু নম্বর, সেটা খালি। ডাইনিং রুমের উল্টো দিকে আরো দুটো ঘর। তার মধ্যে আমাদের ঠিক উল্টো দিকের ঘরটায় থাকেন এলাহাবাদী, আর তার পাশের চার নম্বরে ফেলুদা।

আগেই বলেছি, লালমোহনবাবুকে মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরিতে পেয়ে বসে। ওঁর এখন বোধ হয় সেই রকম একটা মেজাজ এসেছে। ঘরে বসে চা খেতে খেতে বললেন, 'সাহেবকে না হয় ছেড়েই দিলাম; অন্য যে তিনজন আছে তার মধ্যে দুজনের বিষয় তো তবু কিছু জানা গেছে—সত্যি হোক মিথ্যে হোক— কিন্তু আমাদের বাংলোর বাবুটির তো নাম পর্যন্ত জানা যায় নি। ওঁর ঘরটায় একবার উঁকি দিয়ে এলে হত না? মনে হল দরজায় চাবি লাগায়নি!'

আমার আইডিয়াটা ভালো লাগছিল না, তাই বললাম, 'চৌকিদার যদি দেখে ফেলে!'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমি যাই, তুমি পাহারা দাও। চৌকিদার এদিকে আসছে মনে হলে গলা খাক্‌রানি দিলেই আমি চলে আসব। তোমার দাদার কাজ একটু এগিয়ে রাখতে পারলে উনি খুশিই হবেন। এলাহাবাদীর সুটকেসটাও রীতিমত ভারি বলেই মনে হল।'

আমি এরকম ব্যাপার কখনো করিনি। অন্তত ফেলুদা ছাড়া অন্য কারুর জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলাম। আমি চলে গেলাম পিছনের বারান্দায়। সামনে একটা খোলা জায়গার পরেই বাবুর্চিখানার পাশে চৌকিদারের ঘর। চৌকিদারের একটা সাইকেল আছে আগেই দেখেছি, এখন দেখলাম তার দশ বারো বছরের ছেলেটা খুব মন দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করছে। একটা ক্যাঁচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে দেখলাম, লালমোহনবাবু চোরের মতো তিন নম্বর ঘরে ঢুকলেন। মিনিট তিনেক পরে আমার বদলে উনিই একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর তদন্তের কাজ শেষ। ঘরে ফিরে যেতে ভদ্রলোক বললেন, 'পুরনো সুটকেস, ভাবলুম হয়ত চাবি লাগে না, কিন্তু টান দিয়ে খুলল না। টেবিলের ওপর দেখলুম একটা চশমার খাপ—তাতে কলকাতার স্টিফেন কোম্পানির নাম, একটা সোডা মিন্টের বোতল, আর একটা ওডোমসের টিউব। আলনায় সবুজ ডোরা-কাটা শার্ট আর পায়জামা, মেঝেতে এক জোড়া পুরনো চটি— কোম্পানির নাম উঠে গেছে। এ ছাড়া আর কিচ্ছু—'

লালমোহনবাবুর কথা থেমে গেল। ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

'কার জিনিসের ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে?'

ওকে ব্যাপারটা বলতেই হল। ও কিন্তু শুনে বিশেষ রাগটাগ করল না, খালি বলল, 'লোকটাকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ ঘটেছিল কি?'

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিছুই তো জানা যায় নি ওর সম্বন্ধে। এমন কি নামটাও না। এদিকে কি রকম ষণ্ডামার্কা চেহারা....একটা গ্যাঙের কথা বলছিলেন না? —তাই ভাবলুম, মানে....'

'সন্দেহের কারণ না থাকলে এগুলো করতে যাওয়া অযথা রিস্ক নেওয়া। ভদ্রলোকের নাম আর. এন. রক্ষিত। সুটকেসের বাঁ ধারে ফ্যাকফেকে সাদা অক্ষরে লেখা, চোখ থাকলেই দেখা যায়। আপাতত এর বেশি জানার কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'তা হলে বাকি রইল এক সাহেব।'

ফেলুদা বলল, 'সাহেবের নাম স্যাম ল্যুইসন। এও ইহুদী, এও ধনী। নিউ ইয়র্কে এর একটা আর্ট গ্যালারি আছে।'

'কী করে জানলে?' আমি বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'গেস্ট হাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হল। বেড়ে লোক। ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। মূর্তি চুরির কথা কাগজে পড়ে অবধি দিন গুনছে কবে এইখানে সেই চোরের আবির্ভাব হবে।'

'তোমার পরিচয় দিলে?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে বলল, 'ওকে হাতে রাখা দরকার। লোকটা অনেক হেল্প করতে পারবে। ভুললে চলবে না, মল্লিক গেস্ট হাউসে থাকে। সে নাকি অলরেডি বম্বেতে একটা কল বুক করেছিল, লাইন পায়নি।'

রাত্রে ডিনার আমরা চারজনে একসঙ্গে বসে খেলাম। ফেলুদা একটাও কথা বলল না। সেটা তার ছদ্মবেশের জন্য, না মাথায় কোন চিন্তা ঘুরছে বলে, তা জানি না। মিস্টার রক্ষিত একবার লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির কোনো বিশেষ পিরিয়ড নিয়ে তিনি চর্চা করেন কি না। তার উত্তরে লালমোহনবাবু অড়র ডালে ভেজানো হাতের রুটি চিবোতে চিবোতে বললেন যে পিরামিড নিয়ে তাঁর বিশেষ পড়াশুনো নেই, যদিও সেটা যে মিশরে রয়েছে সেটা তিনি জানেন। এতে রক্ষিত একটু থতমত খেয়ে আমার দিকে চাইলে আমি নিজের কানের দিকে দেখিয়ে লালমোহনবাবু যে কানে খাটো সেটা বুঝিয়ে দিলাম। এর পরে ভদ্রলোক আর 'মেজো মামাকে' কোনো প্রশ্ন করেননি।



খাওয়ার পরে আমি আর লালমোহনবাবু যখন বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়ালাম (ফেলুদা তার ঘরে চলে গিয়েছিল) তখন একটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, আর টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা ফিকে জ্যোৎস্না এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোত্থেকে জানি হাসনাহানা ফুলের গন্ধ আসছে, মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে, লালমোহনবাবু আ-আ-আ করে একটা ক্ল্যাসিক্যাল তান দিতে গিয়ে একদম বেসুরো চলে গেছেন, এমন সময় দেখলাম গেস্ট হাউসের দিক থেকে একজন লোক আমাদের দিকে আসছে। আরেকটু

কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। শুভঙ্কর বোস। জটায়ু গান থামিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার দাদা থাকলে ভালো হত।'

'আপনারাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন দেখছি!'

শুভঙ্করবাবুর মধ্যে একটা উস্‌খুসে ভাব লক্ষ্য করলাম। দুবার গলা খাক্‌রালেন, তিনবার পিছন দিকে চাইলেন, তারপর দু'পা এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে—আপনারা নীল সার্টপরা বাঙালী ভদ্রলোকটিকে চেনেন?'

এর কাছে লালমোহনবাবুর কালা সাজা চলবে না, কারণ আগে অনেক কথা হয়েছে। বললেন, 'কই না ত। কেন, উনি কি আমাদের চেনেন বলে বললেন নাকি?'

শুভঙ্কর বোস আরেকবার পেছনদিকে দেখে বললেন, 'লোকটি, মানে, পিকিউলিয়ার। বলছে এলোরায় প্রথম এলো, আর্টে ইন্টারেস্টেড, অথচ কৈলাস দেখে একটিবার পর্যন্ত তারিফ করল না, আহা উহু করল না। আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম, অথচ সেই প্রথমবারের মতোই থ্রিল্ অনুভব করলাম। ভালোই যদি না লাগে ত আসাই বা কেন, আর ভান করাই বা কেন!'

আমরা দুজনে চুপ। এই কথাটাই কি বলতে এলেন ভদ্রলোক?

কাছেই একটা গাছ থেকে একটানা ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে। ছোট্ট শহরটা মনে হচ্ছে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ বেজেছে মাত্র দশটা।

'ইয়ে, ইদানিং খবরের কাগজ পড়েছেন?' শুভঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কেন বলুন ত?' জটায়ু জিগ্যেস করলেন।

'ভারতবর্ষের শিল্পসম্পদ নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। মন্দির থেকে মূর্তি লোপাট হয়ে যাচ্ছে।'

'সত্যি?' খবরটা জানতুম না ত! কী অন্যায়! ছি ছি ছি।'

লালমোহনবাবুর অ্যাকটিংটা খুব পাকা নয়, তাই একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু শুভঙ্কর বোসের সেদিকে লক্ষ্যই নেই। আরেক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'ভদ্রলোক কিন্তু গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেছেন!'

'কোন ভদ্রলোক?'

'মিস্টার মল্লিক।'

'বেরিয়ে গেছেন?'

প্রশ্নটা আমরা দুজনে একসঙ্গে করলাম। সত্যি, ফেলুদার এখানে থাকা উচিত ছিল।

'একবার যাবেন নাকি?' শুভঙ্কর বোসের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'এখন? কোথায়? লালমোহনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে।

'গুহার দিকে।'

'গুহায় পাহারা নেই?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন।

'আছে তবে চৌত্রিশটা গুহার জন্য মাত্র দুজন লোক। কাজেই বুঝতেই পারছেন....। আর ভদ্রলোক একটা ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন —লক্ষ্য করেছেন ত? উনি আর আপনাদের বাংলোর হিপি-টাইপের লোকটি—দুজনেই ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। ওরও কিন্তু ভাবগতিক ভালো না। উনি কে সেটা জানতে পেরেছেন?'

লালমোহনবাবু বিষম খেতে গিয়ে সামলে নিলেন।

'উনি? উনি ফটোগ্রাফ তোলেন। ফার্স্ট ক্লাস ফটো। আমাদের দেখিয়েছেন। এলোরার ফটো তুলছেন। চুংকিং-এর কী একটা পত্রিকার জন্য।'

বাংলো থেকে কে বেরোল? মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে টর্চ, গায়ে ঢাউস রেনকোট। ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর কানের কাছে এসে তারস্বরে 'আফটার ডিনার ওয়ক এ মাইল!' —বলে হেসে গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেলেন।

শুভঙ্কর বোসও 'গুড নাইট' বলে রক্ষিতের পথ ধরলেন। লালমোহনবাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, 'এক মাইল হাঁটতে বললে কেন বল ত লোকটা?'

আমি বললাম, 'ভালো হজম হবে বলে। ....চলুন, এখন ত বাংলো খালি, একবার ফেলুদার খোঁজ করা যাক। ওকে খবরগুলো দেওয়া দরকার। এরা সবাই গুহার দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।'

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাংলোয় ঢুকলাম। মিস্টার বোস সত্যি বললেন কি মিথ্যে বললেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে একবার গুহার দিকে যাওয়া উচিত। যদি কিছু ঘটে তাহলে রাত্রেই ঘটবে। এখনো আলো রয়েছে, গুহার আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা করলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

বাংলোর ভিতরে অন্ধকার। বাইরে চৌকিদারের ঘরে বোধহয় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। আর কোথাও আলো নেই। কোনো শব্দও নেই।

রক্ষিতের ঘরে দরজা বন্ধ থাকবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ফেলুদার দরজাও বন্ধ কেন? আর দরজার তলার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন? ওকি এই সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

বারান্দার দিকে ঘরের জানালা। পা টিপে টিপে গেলাম সেদিকে। জানালার পর্দা টানা। এগিয়ে গিয়ে পর্দা ফাঁক করে দুবার চাপা গলায় ফেলুদার নাম

ধরে ডাকলাম। কোনো উত্তর নেই। ও যদি বেরিয়েও থাকে, সামনের দরজা দিয়ে বেরোয়নি সেটা আমরা জানি। তাহলে কি চৌকিদারের ঘরের পাশে খিড়কি দরজাটা দিয়ে বেরোল?

আমরা দুজন আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। বাতিটা জ্বালাতেই জানলার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা দেখতে পেলাম। তাতে ফেলুদার হাতে লেখা দুটো কথা—

'ঘরে থাকিস।'

'একটা কথা বলব তোমায়?' লালমোহনবাবু বললেন। 'এবার কিন্তু তোমার দাদাটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছেন। আমি ত এমনিতে আর বিশেষ কোনো রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না, তবে তোমার দাদার কার্যকলাপ পদে পদে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।'



ফেলুদা ঘরে থাকতে বলেছে, কিন্তু কখন ফিরবে সেটা বলে যায় নি। অথচ ও যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ ঘুমোনোর কোনো কথাই ওঠে না। কী আর করি—আধ ঘণ্টা কোনোরকমে লালমোহনবাবুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলে কাটিয়ে দিলাম। তারপর লালমোহনবাবু বললেন যে ওঁর লেটেস্ট গল্পের প্লটটা আমায় বলবেন। —'এবার একটা নতুন রকমের ফাইট ইন্ট্রোডিউস করেচি যাতে হিরোর হাত-পা বাঁধা রয়েছে—কিন্তু তাও শুধু মাথা দিয়ে ভিলেনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে।'

মাথা দিয়ে মানে বুদ্ধি দিয়ে না মাথার গুঁতো দিয়ে সেটা জিগ্যেস করতে যাবো এমন সময় দেখি ফেলুদা হাজির। আমরা দুজনেই চুপ, কারণ জানি ও নিজে থেকে কিছু বলতে চাইলেই বলবে, জিগ্যেস করে কোনো ফল হবে না।

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'লালমোহনবাবু, অন্যান্যবারের মতো এবারও কি আপনার সঙ্গে কোনো অস্ত্র আছে নাকি?'

এখানে বলে রাখি লালমোহনবাবুর অস্ত্র সংগ্রহ করার বাতিক আছে। সোনার কেল্লার ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একটা ভুজালি ছিল, আর বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে ছিল একটা বুমেরাং। ফেলুদার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। বললেন, 'এবার আছে একটা বম্ব!'

'বম্ব?' আমি আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলাম। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'বম্ব। বোমা?'

লালমোহনবাবু তার সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেছেন। —'আমাদের পাড়ার দ্বিজেন তরফদারের ছেলে উৎপল আর্মিতে আছে। সে মার্চ মাসে এসেছিল। এইটে আমায় এনে দিয়ে বললে—কাকাবাবু, দেখুন আপনার জন্য কী এনিচি! বড় বড় যুদ্ধে ব্যবহার হয়। —ছোঁড়া আমার লেখার খুব ভক্ত।'

একটা মাঝারি সাইজের টর্চলাইটের মত লম্বা খয়েরি রঙের একটা বেশ ভারি পাইপ জাতীয় জিনিস লালমোহনবাবু সুটকেস থেকে বের করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা সেটা কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'এটা আমার কাছেই থাক। আপনার পক্ষে জিনিসটা বড় বেশি ডেঞ্জারাস।'

'কত মেটাগন হবে বলুন ত?'

কথাটা আসলে মেগাটন, আর সেটা ব্যবহার হয় অ্যাটমবোমা সম্পর্কে। এক মেগাটন মানে দশ লক্ষ টন। ফেলুদা লালমোহনবাবুর প্রশ্নে কান না দিয়ে বোমাটা ঝোলায় পুরে বলল, 'একবার বেরোন দরকার। সবাই বেরিয়েছে, আমাদের ঘরে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।'

ডাক বাংলো থেকে যখন বেরোলাম তখন সাড়ে এগারোটা। ঝিঁঝিটা এখনো ডাকছে। চাঁদের আলো কমছে-বাড়ছে, কারণ আকাশ টুকরো টুকরো চলন্ত মেঘে ছেয়ে গেছে। গেস্ট হাউসের একটা ঘরে দেখলাম আলো জ্বলছে। সেটা নাকি সেই আমেরিকানের ঘর। কে কোন ঘরে থাকে সেটাও নাকি ফেলুদা ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। মল্লিক আর শুভঙ্কর ফিরেছে কিনা বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ থেকেই ঘন ঘন মেঘ ডাকছিল; যখন বড় রাস্তার উপর এসে পড়েছি তখন একটা বড়রকম গর্জন শুনে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি পূব দিকটা কালো হয়ে আসছে। 'এই মরেছে! বৃষ্টি আসবে নাকি?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'এত গুহা থাকতে বৃষ্টি এলে আশ্রয়ের অভাব হবে না', বলল ফেলুদা।

কৈলাসের দিকে উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোনো চেষ্টা না করে ফেলুদা বাঁ দিকের পথ ধরল। কিন্তু সে পথেও বেশি দূর না। খানিকটা গিয়েই সে দেখি পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। ওর কায়দাকানুন একটু আধটু জানি বলে আন্দাজ করলাম যে সামনের দিক দিয়ে ছাড়া গুহায় ঢোকার কোনো রাস্তা আছে কিনা সেটাই ও একটু ঘুরে দেখতে চাইছে। আশেপাশে ঝোপঝাড় আর পাথরের টুকরো, কিন্তু এখনো চাঁদের আলো থাকায় সেগুলো কোনো বাধার সৃষ্টি করছে না।

এইবার ফেলুদা ডান দিকে মোড় নিল। বুঝলাম যে-দিক থেকে এসেছি সেদিকেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু রাস্তা দিয়ে নয়; পাহাড়ের গা দিয়ে—রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে।

খানিকটা গিয়েই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দৃষ্টি ডানদিকে। আমরা থেমে সেইদিকে দেখলাম।

দূরে পশ্চিম দিকে ঠিক যেন মনে হচ্ছে জমির উপর একটা সিল্কের ফিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আসলে সেটা শহরে যাবার রাস্তা, চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে।

সেই রাস্তা দিয়ে একজন লোক দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে গেস্ট হাউসের দিকে। অথবা বাংলোর দিকে। কারণ রাস্তা একটাই।

'মিস্টার রক্ষিত নন', ফিস্‌ফিস্ করে বললেন লালমোহনবাবু।

'কী করে বুঝলেন?' চাপা গলায় জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'রক্ষিতের গায়ে রেনকোট ছিল।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন লালমোহনবাবু।

লোকটা একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

খস্‌স্....খস্‌স্....খস্‌স্....খস্‌স্....

একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে আমরা তিনজন আবার থেমে গেলাম। কোত্থেকে আসছে আওয়াজটা?

ফেলুদা বসে পড়ল। আমরাও। সামনে একটা প্রকাণ্ড মনসার ঝোপ। সেটা আমাদের আড়াল করে রেখেছে।

আওয়াজটা আরো কিছুক্ষণ চলে থামল। তারপর সব চুপ।

এ কি—চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কেন? আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সেই কালো মেঘটা চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে। আমরা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম। খানিকটা হাঁটার পর ডানদিকে কৈলাসের খাদটা পড়ল। খাদের পাশেই....ওই যে মন্দির। মন্দিরের চূড়ো এখন আমাদের সঙ্গে সমান লেভেলে। চূড়োর পিছনে বেশ খানিকটা নীচুতে একটা ছাত—তার মাথায় চারটে সিংহ চারদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে নীচে দূরে হাতি দুটো দেখা যাচ্ছে।

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। আওয়াজটা এদিক থেকেই এসেছে সেটা বুঝেছিলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। হয়ত আছে, অন্ধকার

বলে দেখা যাচ্ছে না। আমি জানি ফেলুদা টর্চ জ্বালাবে না, কারণ তাহলে অন্য লোক আমাদের কথা জেনে যাবে।

কৈলাসের খাদের পর কিছু দূর গিয়ে আরেকটা খাদ। এটা পনের নম্বর গুহা। সেটা ছাড়িয়ে তার পরের গুহাটার দিকে এসেছি। এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ থেমে টান হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস কথা—

'টর্চ জ্বেলেছে। পনের নম্বর গুহার ভিতরে। তার ফলে গুহার বাইরের আলোটা একটু বেড়েছে।

আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করিনি। লালমোহনবাবুও না। ফেলুদার চোখই আলাদা।

দু মিনিট প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ফেলুদা একটা ব্যাপার করল। একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ওপর থেকে গুহার সামনের চাতালটায় ফেলল। টুপ করে একটা শব্দ পেলাম।



তারপর বুঝতে পারলাম চাতালটা হঠাৎ যেন আরো বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। তার মানে টর্চটা নিভল। আর তার পরেই একটা লোক নিঃশব্দে চোরের মতো গুহা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল।

'মিস্টার রক্ষিত না', আবার ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু। লোকটাকে চিনতে না পারলেও, তার গায়ে যে রেনকোট নেই সেটা আমিও বুঝেছিলাম।

এরপর এলো আমার জীবনের সবচেয়ে লোমখাড়া করা সময়। ফেলুদা ইতিমধ্যে নীচে যাবার একটা রাস্তা বার করে ফেলেছে। রাস্তা না বলে বোধ হয় উপায় বলা উচিত। খানিকটা লাফিয়ে, খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে, খানিকটা বাঁদরের মত ঝুলে, খানিকটা মাটির উপর ঘসটে. সে দেখতে দেখতে নিচে গুহার সামনেটায় পৌঁছে গেল। লালমোহনবাবু চাপা গলায় বললেন. 'গোয়েন্দাগিরিতে ফেল করলে সার্কাসের চাকরি বাঁধা।' পরমুহূর্তেই দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মানে গুহার ভিতর ঢুকেছে। আমার কিন্তু ঘাম ছুটে লোমটোম খাড়া হয়ে গেছে।

প্রায় তিন মিনিট (মনে হচ্ছিল তিন ঘণ্টা) পরে আবার দেখতে পেলাম ফেলুদাকে। তারপর আরম্ভ হল উলটো কসরৎ। উপর থেকে নিচেব বদলে নিচের থেকে উপরে। এক হাতে টর্চ, কাঁধে ব্যাগ আর কোমরে রিভলবার

নিয়ে কীভাবে এরকম ওঠানামা সম্ভব তা ওই জানে। উপরে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এটার নাম দশাবতার গুহা। দোতলা। দুর্দান্ত সব মূর্তি আছে। লোভনীয়।'

'লোকটা কে ছিল বুঝলে?'—ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম। ফেলুদার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'যত সহজ ভাবছিলাম, তা নয়। প্যাঁচ আছে। রহস্য আছে মাথা খাটাতে হবে।'

পাহাড় থেকে নেমে এসে বুঝলাম তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। ফেলুদা কৈলাসের সামনে গিয়ে পাহারাদারের সঙ্গে দেখা করল। তাকে জিগ্যেস করে জানা গেল সে গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোনো গোলমেলে ব্যাপার লক্ষ্য করেনি। অবিশ্যি ও যেখানে পায়চারি করছে সেখান থেকে খাদের উপরটা দেখা যায় না; মন্দিরের চুড়োয় ঢাকা পড়ে।

'কোনো শব্দ-টব্দ শোননি?'—ফেলুদা হিন্দিতে জিগ্যেস করল।

না, শব্দও শোনেনি। এমনিতেই মেঘ ডাকছে ঘন ঘন, শব্দ কি করে শুনবে?

'একবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখতে পারি?'

জানতাম লোকটা না বলবে, আর বললও তাই।

'নেহি বাবু, অর্ডার নেহি হ্যায়।'

ফেরার পথে বাংলোর কাছাকাছি এসে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। আমরা আসছিলাম পূব দিক দিয়ে। বাংলোর পূব দিকের দেয়ালে দুটো জানালা রয়েছে—একটি রক্ষিতের ঘরের, একটা ফেলুদার ঘরের। ফেলুদার ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু রক্ষিতের ঘরের ভেতর একটা আলোর তাণ্ডব চলেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা টর্চের আলো, কিন্তু সেটা কেন যে পাগলের মতো এদিক ওদিক করছে সেটা বোঝা মুশকিল। একবার আলোটা জানালার কাছে এল। বুঝলাম সেটা গেস্ট হাউসের দিকে ফেলা হচ্ছে। আলোটা ঝোপঝাড়ের উপর ঘোরাফেরা করে আবার ঘরে ফিরে গেল। ফেলুদা চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং।'

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

৮

আমি অনেক সময় দেখেছি যে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো কখন যে কোন রাস্তায় চলবে সেটা আগে থেকে বোঝা ভারি মুশকিল হয়। কিছুদূর হয়ত আন্দাজ-মাফিক গেল, তারপর হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যার

জন্য রাস্তার মোড় গেল ঘুরে; ফেলুদার মাথা আশ্চর্য ঠাণ্ডা বলে ও বাধা পেলেও বা বেকায়দায় পড়লেও কখনো দিশেহারা হয় না। কিন্তু আজ একটা ব্যাপারে তাকে বেশ বিরক্ত হতে দেখলাম।

কাল রাত্রে কৈলাসের ওপরে গিয়ে যে শব্দটা শুনেছিলাম, সে ব্যাপারে একটু তদন্তের দরকার বলে আমরা ঠিক করেছিলাম ভোরে ভোরেই কৈলাসে চলে যাব। ফেলুদা রাত্রে মেক-আপ তুলে শুয়েছিল, আজ সকালে আমাদেরও আগে উঠে সে তৈরি হয়ে নিয়েছে, আর আমিও সিঁথিটা ডান দিকে করে নিয়েছি। লালমোহনবাবুও কোনো একটা কিছু মেক-আপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা বারণ কবাতে চুপ করে গেলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুহা খুলে যায়, লোক ঢুকে দেখতে পারে। সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে বেরিয়ে ছ'টার মধ্যে গুহায় পৌঁছে বাইরে বড় বড় গাড়ি আর লোকজনের ভিড় দেখে একবারে তাজ্জব বনে গেলাম।



আরেকটু কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। ফিল্ম কোম্পানি এসেছে, কৈলাসে সুটিং হবে! একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেব সামনে সুটিং দেখেছিলাম, তখন রিফ্লেক্টর জিনিসটা দেখে চিনে রেখেছিলাম; এবারও সেই রিফ্লেক্টর দেখেই সুটিং-এর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, 'সেরেছে—এরা আর জায়গা পেল না? শেষটায় কৈলাসের শ্রাদ্ধ করতে এসেছে?

জিগ্যেস করে জানতে পারলাম যে দলটা বোম্বাই থেকে এসেছে, হিন্দি ফিল্মের সুটিং হচ্ছে। যারা অ্যাকটিং করবে তারা নাকি এখনো এসে পৌঁছয়নি, তবে অন্য সব কাজের লোক বেশির ভাগই এসে পড়েছে।

একজন ইয়াং ছেলের প্যান্টের পকেট থেকে একটা বাংলা ফিল্ম পত্রিকার খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে দেখে লালমোহনবাবু তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'কী বই হচ্ছে ভাই?' 'ছেলেটি বলল, 'ক্রোড়পতি।'

'কে কে পার্ট করচে?'

'টপ কাস্টিং। এখানে আসছে রূপা, অর্জুন মেরহোত্রা আর বলবন্ত চোপরা। হিরোইন, হিরো আর ভিলেন।'

অর্জুনের নাম শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। জিগ্যেস করলেন, 'গান হবে নাকি ভাই?'

'না। ফাইট। স্টান্টম্যান, ডাবল—সব এসেছে। হিরো ভিলেনকে চেজ করবে, ভিলেন গুহা থেকে মন্দিরের ভেতর ঢুকে যাবে।

'আর হিরোইন?'

'হিরোইন সাইডের একটা কেভের মধ্যে রয়েছে। ওখানে ভিলেন ওকে অ্যাটাক করছে। হিরো এসে পড়ছে, ভিলেন পালাচ্ছে। ক্লাইম্যাক্স মন্দিরের চূড়োয়।'

'চূড়োয়!'

'চূড়োয়।'

'পরিচালক কে?'

'মোহন শর্মা। কিন্তু এই সুটিংটায় থাকছে ফাইট ডাইরেক্টর আপ্পারাও।'

আরো জিগ্যেস করে জানলাম যে সুটিং হতে হতে দশটা, আর দুপুরেই কাজ শেষ। তার মানে আজকের দিনটা এরাই কৈলাসটা দখল করে রাখবে।

'তাজ্জব ব্যাপার!' ফেলুদা বলল। —'এই পারমিশনটা পাওয়া কীভাবে সম্ভব হল জানতে ইচ্ছে করে। টাকায় কীই না করে।'

ভেতরে না ঢুকতে পারলেও কাল রাত্রে যেখানে পাহাড়ের উপরে খাদের পাশটায় গিয়েছিলাম, সেখানে যেতে আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। তাই ভেবে কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু সে গুড়েও বালি। আমাদের আগেই ফিল্মের দলের কিছু লোক সেখানে হাজির হয়ে গেছে। তার মধ্যে একজন বোধহয় ক্যামেরাম্যান, কারণ সে ডান হাতের আঙুলগুলো ফুটোস্কোপের মতো করে চোখের সামনে পাকিয়ে ধরে মন্দিরের চূড়োর দিকে দেখছে। মন্দিরের ভিতর কিন্তু এখনো কোনো লোক ঢোকেনি। নিচে থাকতেই জেনেছিলাম পারমিশনের চিঠিটা নাকি অন্য গাড়িতে আসছে। দারোয়ান যতক্ষণ না চিঠিটা দেখছে ততক্ষণ কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।

ফেলুদা জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এরা আমাদের কাজটা পণ্ড করতেই এসেছে। চল্, একবার পনের নম্বর গুহাটায় যাই—ভালো মূর্তি আছে। এই উদাত্ত পরিবেশে ফিল্ম কোম্পানির কচকচি ভালো লাগছে না।'

আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম তার উল্টোদিক দিয়ে নেমে পনেরো নম্বর গুহার দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম মেন রোড দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হলদে আমেরিকান গাড়ি কৈলাসের দিকে আসছে। বুঝলাম হিরো হিরোইন ভিলেন আর ফাইট ডাইরেক্টর এসে গেছেন।

পনের নম্বর গুহাই হল দশাবতার গুহা। তার সামনে পৌঁছানর আগেই দুই অবতারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন হলেন মিস্টার রক্ষিত, আর অন্যজন মিস্টার ল্যুইসন। গুহার মুখটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দুজন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমেরিকানটি, 'আই সী নো পয়েন্ট ইন মাই স্টেইং হিয়ার এনি লঙ্গার' বলে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মিস্টার রক্ষিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে তেতো হাসি হেসে বললেন, 'এখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্বন্ধে কমপ্লেন করছিল। বলছে ডিমটা পর্যন্ত ঠিক করে ভাজতে জানে না, আর আশা করে যে আমরা এখানে এসে ডলার ঢেলে দিয়ে যাব। টাকার গরম আর কি!'

ফেলুদা বলল, 'আশ্চর্য ত। শুনেছিলাম আর্টের সমঝদার, আর এখানে এসে ডিম ভাজার কথাটাই মনে হল?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমেরিকায় ডিম কি করে ভাজে মশাই?'

রক্ষিত কী জানি একটা উত্তর দিতে গিয়ে আর দিতে পারলেন না। কৈলাসের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার এসে আমাদের সকলেরই পিলে চমকে দিয়েছে। লালমোহনবাবু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ফাইট শুরু হয়ে গেছে মশাই! ভিলেন চ্যাচাচ্ছে!'

চিৎকারের পর আরো অন্য গলায় চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। ফাইট হলে এত লোক চেঁচাবে কেন? আমরা ফেলুদার পিছন পিছন ব্যস্তভাবে কৈলাসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এত ছুটোছুটি গোলমাল কিসের জন্য?

যখন গেটের কাছাকাছি এসে গেছি তখন দেখলাম চার পাঁচজন লোক চ্যাংদোলা করে একটি বেগুনী হাওয়াইয়ান সার্ট পরা লোককে হলদে গাড়িটার দিকে নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এলো হিরো হিরোইন আর ভিলেন। এদের তিনজনেরই মুখ চেনা। রূপা অর্জুনের কাঁধে ভর করে এগিয়ে আসছে, বলবন্ত তাদের পাশেই মাথা হেঁট করে রূপার কাঁধে একটা হাত দিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এবারে সেই বাঙালী ছেলেটিকে দেখে আমরা চারজনেই তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কী হয়েছে মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'লাশ পড়ে আছে মন্দিরের পেছন দিকে....হরিবল ব্যাপার....হাড়গোড় সব....'

'চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল কাকে?'

'আপ্পারাও। উনিই প্রথম দেখলেন, আর দেখেই সেন্‌সলেস।

ফেলুদা আর মিস্টার রক্ষিত আগেই মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিল। এবার আমরা দুজনও গেলাম। ফিল্মের লোকজন সব বেরিয়ে আসছে, বুঝলাম সুটিং আর হবে না।

মন্দিরের বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, ডানদিকে কৈলাসের নিচের দিকটায় সারি সারি হাতি আর সিংহের মূর্তি; মনে হয় তারাই যেন মন্দিরটাকে কাঁধে করে রয়েছে। সামনে মোড় ঘুরে ডান দিকে গিয়েই বোধহয় মৃতদেহ, কারণ সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা পৌঁছানর আগেই মিস্টার রক্ষিত ভিড় থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওদিকে যাবেন না। বিশ্রী ব্যাপার।' আমরাও যে খুব একটা যাবার ইচ্ছে ছিল তা নয়, কারণ এ ধরনের রক্তাক্ত দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না; তবু কে মারা গেছে জানার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। সে কৌতূহলটা মিটিয়ে দিল ফেলুদা। মিস্টার রক্ষিত চলে আসবার এক মিনিটের মধ্যেই ফেলুদাও ফিরে এসে বলল, 'শুভঙ্কর' বোস। মনে হয় পাহাড়ের উপর থেকে সোজা পড়েছেন পাথরের মাটিতে।'



লালমোহনবাবু শুনলাম বিড়বিড় করে বলছেন, 'আশ্চর্য! ঠিক এইভাবেই মরবার কথা ঘনশ্যাম কর্কটের।'

ফেলুদা আবার বাইরের দিকে চলেছে, আমরা দুজন তার পিছনে। মিস্টার রক্ষিত এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের আসতে দেখে থেমে বললেন, 'কাল রাত্রে যখন এদিকটায় বেড়াতে আসি, তখনই দেখলাম ভদ্রলোক পাহাড়ের উপর উঠছেন। আমি বারণ করেছিলাম। ভদ্রলোক আমার কথায় কানই দিলেন না। তখন কি জানি যে লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?'

মিস্টার রক্ষিত চলে গেলেন। একটা নতুন কথা বলে গেলেন বটে ভদ্রলোক। আত্মহত্যার কথাটা আমার মনেই হয়নি। ফেলুদা মিস্টার রক্ষিতের কথায় যেন আমল না দিয়েই আবার কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল।

আধঘন্টা আগেই দেখেছিলাম খাদের পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, এখন দেখছি একটি লোকও নেই। মনে মনে বললাম শুভঙ্কর বোস মরে গিয়ে আমাদের কাজের সুবিধে করে দিয়েছেন।

ফেলুদা দেখলাম বেশ বেপরোয়াভাবে এগিয়ে গিয়ে খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাড় নীচু করে মন্দিরের পিছনে যেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানটা দেখছে। যেখান থেকে পড়েছেন শুভঙ্কর বোস, সেই জায়গাটা আন্দাজ করে ও খাদের আশপাশটা খুব ভালো করে দেখতে লাগল।

মাটিতে একটা গর্ত। লোক চলাচলে মাটি ঢুকে সেটা খানিকটা বুজে এসেছে, কিন্তু তাও ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা স্কেলটা খুলে তার মধ্যে ঢোকাতে সেটা প্রায় হাত ভেতরে চলে গেল। গর্তটা খাদ থেকে হাত তিনেক দূরে। এবার ফেলুদা গর্তটার ঠিক সামনে খাদের ধারটা পরীক্ষা করতে লাগল। আমি আর লালমোহনবাবুও দেখছি, আর বেশ বুঝতে পারছি কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খাদের ধারের মাটির উপর একটা গভীর খাঁজ পড়েছে।

'কিছু বুঝতে পারছিস, তোপ্‌শে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। আমি চুপ করে আছি দেখে সে নিজেই উত্তর দিল—

'এটা দড়ির দাগ। একটা শাবল গোছের জিনিস গভীরভাবে পুঁতে সেটায় একটা দড়ি বেঁধে খাদের ভিতর ঝুলিয়ে সেটা ধরে কেউ নেমেছিল বা নামতে চেষ্টা করেছিল। কাল রাত্রে খস খস শব্দটা মনে পড়ছে? সেটা ছিল দড়িটাকে টেনে তোলার শব্দ। সামনে দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, তাই পিছন দিয়ে ঢোকার এই ব্যবস্থা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু দড়ি হলে....একশো ফুট....মানুষ ধরে নামবে....সে ত মোক্ষম দড়ি হতে হবে মশাই!

'নাইলনের দড়ি। হালকা, অথচ প্রচন্ড শক্ত', বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'তার মানে ত শুভঙ্কর বোস ছাড়া আরেকজন লোক ছিল!'

'ন্যাচারেলি। সেই লোকই দড়ি টেনে তুলেছে, সেই শাবল[illegible] সরিয়ে ফেলেছে। সে শুভঙ্কর বোসের শত্রু বা মিত্র সেটা এখনো [illegible] নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে একটা কারণে শত্রু বলেই মনে হয়।'

আমরা ফেলুদার দিকে চাইলাম। ফেলুদা তার সার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে হাতের তেলোয় ধরে আমাদের দেখাল।

একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। নীল রঙের কাপড়। কাল কাকে দেখেছি নীল শার্ট গায়ে?

মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক।

'কোথায় পেলে ওটা?'—কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম। ফেলুদা বলল, 'উপুড় হয়ে পড়েছিল শুভঙ্কর বোস। হাত দুটো ছড়ানো। বাঁ হাতটা মুঠো

অবস্থায়। দু' আঙুলের মাঝখান দিয়ে টুক্‌রোটা বেরিয়ে ছিল। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় খাদের ধারে। শুভঙ্কর শার্ট খামচিয়ে ধরে। তারপর পড়ে যায়। টুক্‌রোটা হাতে ছিঁড়ে আসে।'

'ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন—'ত্‌ তার মানে ত ম্‌-মার্ডার!'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় কোনো মন্তব্য না করে গম্ভীরভাবে বলল, 'একটা কথা বলতেই হবে—কৈলাস এখনো অক্ষত রয়েছে, আর সেটার জন্য দায়ী শুভঙ্কর বোস। তিনি মরলেন বলেই মূর্তি চোরকে কাজ না সেরেই পালাতে হল। আর সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে গেল। কৈলাসে সত্যিই লাশ পাওয়া গেল।'

৯

খাদের মাথা থেকে যখন নিচে নামলাম ততক্ষণে ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা সরে পড়েছে। তার বদলে এখন স্থানীয় লোকের ভিড়। আর আমেরিকান গাড়ির বদলে রয়েছে একটা জীপ। একজন বছর পঁয়ত্রিশের স্মার্ট ভদ্রলোক ফেলুদাকে দেখে এগিয়ে এলেন। ইনিই নাকি মিস্টার কুলকার্নি—টুরিস্ট গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। ফেলুদার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা হল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল রাত্রে যে মিস্টার বোস ফেরেননি সেটা আজ ভোরে জানা গেছে। একটি বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম ওর খোঁজ করতে, সে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে।'

'এখন কী ব্যবস্থা হচ্ছে? ফেলুদা প্রশ্ন করল। কুলকার্নি বললেন, 'আওরঙ্গাবাদে খবর পাঠানো হয়েছে। সি ডি ভ্যান আসছে, ডেডবডি মর্গে নিয়ে যাবে। মিস্টার বোসের ভাই আছেন দিল্লিতে। লাশ সনাক্ত করার ব্যাপারে তাকে খবর পাঠানো হচ্ছে। ....ভেরি স্যাড! ভদ্রলোক সত্যিই পণ্ডিত ছিলেন। আগেও একবার এসেছিলেন—সিক্সটি এইটে। গেস্ট হাউসেই ছিলেন। এলোরার ওপর বই লিখছিলেন।'

'আপনাদের এখানে থানা নেই?'

'একটা পুলিশ আউটপোস্ট আছে। ছোট জায়গা ত! একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর চার্জে আছেন। মিস্টার ঘোটে। আপাতত ডেডবডি ইন্‌সপেক্ট করছেন।'

'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?'

'সার্টেনলি!.... ভালো কথা—'

কুলকার্নি কী যেন একটা গোপনীয় কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু আমরা দুজন বাইরের লোক রয়েছি বলে ইতস্তত করছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি এদের সামনে বলতে পারেন।' কুলকার্নি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আজ সকালে বম্বেতে একটা ট্রাঙ্ক কল হয়েছে।'

'মল্লিক?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল নোট করেছেন?'

কুলকার্নি পকেট থেকে একটা কাগজের স্লিপ বার করে সেটা থেকে পড়ে বললেন, 'মে বালু আচে। আজ রওয়ানা হচি।'

মেয়ে ভালো আছে, আজ রওনা হচ্ছি। আবার সেই মেয়ের ব্যাপার।

'যাবার কথা বলেছে কিছু?' ফেলুদা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন করল।

কুলকার্নি বললেন, 'উনি ত আজই সকালে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবেই একটা ফন্দি বার করে যাওয়াটা পিছিয়ে দিয়েছি। ওর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টিপে দিয়েছি। ডিফারেনসিয়াল গণ্ডগোল—গাড়ি সারাতে টাইম লাগবে।'

'ব্রাভো! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

ফেলুদার তারিফে কুলকার্নির চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'ভালো কথা—আপনার এই ঘোটে লোকটি কেমন?'

'বেশ লোক। তবে মনমরা হয়ে থাকে। এ জায়গা তার ভালো লাগে না। কবে প্রোমোশন হবে, আওরঙ্গাবাদে পোস্টেড হবে, তাই দিন গুনছে। ....আসুন না, আলাপ করিয়ে দিই।'

মিস্টার ঘোটে কেভ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কাছাকাছির মধ্যেই ছিলেন, কুলকার্নি তাকে ডেকে এনে ফেলুদাকে 'বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ' বলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট, চওড়াতেও প্রায় ততখানিই বলে মনে হয়, তার উপরে আবার চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ। কিন্তু মোটা হলে কি হবে, হাঁটাচলা বেশ চট্‌পটে।

ঘোটের সঙ্গে কথা বলার আগে ফেলুদা আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা বরং বাংলোয় ফিরে যা—আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।'

কী আর করি। গেলাম ফিরে বাংলোয়। ভোরে শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম,

তাই বেশ খিদে পাচ্ছিল। বারান্দায় গিয়ে চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে দুজনের জন্য ডিমরুটি করতে বলে দিলাম।

ঘরে ফিরে এসে দেখি লালমোহনবাবু কেমন যেন বোকা বোকা ভাব করে খাটে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আমরা কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম?'

আমি বললাম, 'না ত। নেবার মতো কীই বা আছে বলুন! তাছাড়া এরা ত সকালবেলা ঘর ঝাড়পোঁছ করে, তাই.... কেন, কিছু হারিয়েছে নাকি?'

'না, কিন্তু জিনিসপত্তর সব ওলট-পালট হয়ে আছে। আমার খাটে বসে আমার বাক্স ঘেঁটেছে। এই কিছুক্ষণ আগে। খাট এখনো গরম হয়ে আছে। তোমার বাক্সটা দেখ ত।'

সুটকেসটা খোলামাত্র বুঝতে পারলাম সেটা কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানে নেই। শুধু বাক্স না, বালিশ-টালিশও এদিক ওদিক হয়ে আছে। এমন কি খাটের তলাতেও যে খুঁজেছে সেটা আমার চটি জোড়া যেভাবে রাখা রয়েছে তার থেকে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিসের জন্য সবচেয়ে ভয ছিল জান? আমাব নোটবুকটা। সেটা দেখছি নেয়নি।'

'অন্য কিছু নিয়েছে নাকি?'

'কই, কিছুই ত নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তোমার?'

'আমারও তাই। কিছুই নেয়নি। যে এসেছিল সে বিশেষ কোনো একটা জিনিস খুঁজতে এসেছিল। সেটা পায়নি।'

'একবার চৌকিদারকে জিগ্যেস করলে হয় না?'

কিন্তু চৌকিদারকে জিগ্যেস করে কোনো ফল হল না। সে বাজার করতে গিয়েছিল, তখন যদি কেউ এসে থাকে। এখানে কোনোদিন কিছু চুরিটুরি যায় না, কাজেই বাইরের লোক এসে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যাবে এটা তার কাছে খুবই আশ্চর্য লাগল।

হঠাৎ মনে হল ফেলুদার ঘরে লোক ঢুকেছিল কিনা জানা দরকার। গিয়ে দেখি ফেলুদা দরজা লক করে গেছে। সেটার অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ও নিজে ছদ্মবেশে রয়েছে বলে ওর একটু সাবধান হতে হয়। লালমোহনবাবু বললেন, 'একবার মিস্টার রক্ষিতকে জিগ্যেস করবে নাকি?'

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে টর্চের খেলা দেখে আমার এমনিই রক্ষিত সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবুর প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে দুজনে

ভদ্রলোকের দরজায় গিয়ে আস্তে করে টোকা মারলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দরজা খুলে গেল।

'কী ব্যাপার? ভেতরে এসো?'

ভদ্রলোক যে খুব একটা খুশি খুশি ভাব দেখালেন তা নয়; তাও যখন ডাকছেন তখন গেলাম।

'আপনার ঘরেও কি লোক ঢুকেছিল?' লালমোহনবাবু ঢুকেই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে তাকাতেই বুঝলাম ভাবগতিক ভালো না। চাপা অথচ ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনাকে বলে ত লাভ নেই, কারণ আপনি কানে শোনেন না, কাজেই আপনার ভাগনেটিকেই বলছি। —লোক শুধু ঢোকেনি. আমার একটি অত্যন্ত কাজের জিনিস সযত্নে তুলে নিয়ে গেছে।'

'কী জিনিস?' আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

'আমার রেনকোট। বিলিতি রেনকোট। আজ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবহার করছি!'

মেজোমামা চুপ। কালা সেজে আছেন। আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে তাকে খবরটা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'কাল রাত্রে নিয়েছিল কি? কাল দেখলুম আপনি কী যেন খুঁজছেন। আপনার টর্চটা....'

'না। কাল রাত্রে একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছিল। বাতি নিভিয়ে টর্চ জ্বেলে সেটাকে তাড়াতে চেষ্টা করছিলুম। কাল আমার কোনো জিনিস খোয়া যায়নি। গেছে আজ সকালে। আর আমার ধারণা সেটা নিয়েছে চৌকিদারের ওই ছেলেটা।'

এ কথাটাও চেঁচিয়ে মেজোমামাকে শুনিয়ে দিলাম। উনি বললেন, 'শুনে দুঃখিত হলাম। ছেলেটির দিকে চোখ রাখতে হয় এবার থেকে।'

এর পরে আর কিছু বলার নেই। আমরা ভদ্রলোককে ডিসটার্ব করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চৌকিদার ডিমরুটি এনে দিয়েছিল, দুজনে খাবার ঘরে বসে খেলাম। আমেরিকায় ডিম কি করে ভাজে জানি না, আমাদের এই খুলদাবাদের ডিম ফ্রাই বেশ ভালোই লাগছিল। ঘরে কে ঢুকে থাকতে পারে সেটা ভাবতে মনটা খচ্ খচ্ করছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা হয়ত সত্যিই চৌকিদারের ওই ছেলেটা। ও মাঝে মাঝে বাংলোর পশ্চিমদিকের মাঠটায় পায়চারি করে, আর পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে দেখে, সেটা লক্ষ্য করেছি।

যদিও ফেলুদা বাংলোয় ফিরে যেতে বলেছিল, তার মানে যে ঘরেই বসে

থাকতে হবে এমন কোনো কথা আছে কি? চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা বাংলোর বাইরে রাস্তায় এলাম।

বাংলোর ঠিক সামনে থেকে গেস্ট হাউসটা দেখা যায় না, একটা অচেনা গাছ সামনে পড়ে। গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ পেয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। এবার গেস্ট হাউসটা দেখা যাচ্ছে। আওরঙ্গাবাদ থেকে যে ট্যাক্সিটা মিস্টার রক্ষিত আর ল্যুইসনকে নিয়ে এসেছিল, সেটা যাবার জন্য তৈরি, ছাতের উপর মাল চাপানো রয়েছে, আমেরিকান ক্রোড়পতি মিস্টার স্যাম ল্যুইসন বেয়ারাকে বকশিশ দিচ্ছেন।

কিন্তু ইনি আবার কে?

আরেকটি লোক গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ল্যুইসনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছেন। ল্যুইসন দুবার মাথা নাড়ল। তার মানে কোনো একটা প্রস্তাবে রাজী হল। এবার অন্য ভদ্রলোকটি আবার গেস্ট হাউসে ঢুকে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে বেরোলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ডালা খুলে দিল। বাক্স ভিতরে ঢুকে গেল। ডালা বন্ধ হল। আমার বুকের ভিতর ভীষণ ধুকপুকুনি। লালমোহনবাবু আমার হাত খামচে ধরলেন।

জয়ন্ত মল্লিক নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে অ্যামেরিকানের সঙ্গ নিয়ে পালাচ্ছেন।

ড্রাইবার তার জায়গায় গিয়ে বসল।

'চৌকিদারের সাইকেল!'—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট দেবার শব্দ পেলাম।

আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে কোনো রকমে টেনে হিঁচড়ে সাইকেলটাকে বাইরে আনলাম।

'উঠে পড়ুন।'

লালমোহনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি জীবনে এই প্রথম সাইকেলের পিছনে চাপলেন। আমি জানি অন্য সময় হলে চাপতেন না—কিন্তু অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া গতি নেই।

ট্যাক্সি বেরিয়ে চলে গেছে। আমি প্রাণপণে পেডাল করে চলেছি। জটায়ু আমার কোমর খামচে ধরেছেন। সাত বছর বয়সে সাইকেল চালাতে শিখেছি। ফেলুদাই শিখিয়েছিল। অ্যাদ্দিনে সেটা কাজে দিল।

বিশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেলাম। ওই যে ফেলুদা—ওই যে ঘোটে, কুলকার্নি।

'ফেলুদা! মিস্টার মল্লিক পালিয়েছেন—সেই অ্যামেরিকানের ট্যাক্সিতে—এই পাঁচ মিনিট আগে!'

এই একটা খবরের দরুণ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটে গেল যে, এখনো ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। জীপও যে ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম জানলাম। আমি আর জটায়ু পিছনে ঘাপটি মেরে বসে আছি, সামনে ড্রাইভারের পাশে ঘোটে আর ফেলুদা, দেখতে দেখতে ট্যাক্সি কাছে চলে আসছে, তারপর হর্ন দিতে দিতে সেটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে থামলো, ক্রোড়পতি ল্যুইসনের চোখরাঙানি আর বাছাই বাছাই মার্কিনি গালির বিস্ফোরণ, আর তারই মধ্যে মল্লিকের ফ্যাকাসে মুখ, একবার বাধা দিতে গিয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়া, আর তারপর ঘোটে তার সুটকেস খুলল, আর তা থেকে টার্কিশ টাওয়েলের প্যাঁচ খুলে বেরোল যক্ষীর মাথা, আর লালমোহনবাবু হাঁফ ছেড়ে বলা এণ্ডস্ ওয়েল অলস্ ওয়েল দ্যাট অর ল্যুইসনের হাঁ হয়ে যাওয়া আর দুবার 'বাট্'....বাট্ বলা, আর সবশেষে ল্যুইসন ট্যাক্সি করে আওরঙ্গাবাদ, আর আমরা বামাল সমেত চোর গ্রেপ্তার করে খুলদাবাদ।

মল্লিক অবিশ্যি এখন ঘোটের জিম্মায়। অর্থাৎ তিনি এখন খুলদাবাদ পুলিস আউটপোস্টের বাসিন্দা। ভদ্রলোক এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনো কথাই বলতে পারেন নি।

ঘোটে আমাদের গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিলেন, কারণ কুলকার্নি ওখানে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 'মিশন সাকসেসফুল' শুনে কুলকার্নি অবিশ্যি দারুন খুশি হলেন, কিন্তু ফেলুদা যেন তার উৎসাহে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলেই বলল যে, এখনো কাজ বাকি আছে।—'আর তা ছাড়া আপনি বম্বের ওই নাম্বারটা নিয়ে কিন্তু এনকোয়ারিটা করবেন, আর খবর পেলেই আমাকে জানাবেন।

শেষের ইনস্ট্রাকশনটার ঠিক মানে বোঝা গেল না, তবে এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে হল না।

কুলকার্নি সকলের জন্য কফি বলেছিলেন, সেটা খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ল আমাদের ঘরে যে লোক ঢুকে জিনিসপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, আর রক্ষিতের ঘর থেকে রেনকোট চুরি গেছে, সে খবরটা ফেলুদাকে দেওয়া হয়নি। সেটা ওকে বলাতে ও কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুটি করে ভাবল। তারপর কুলকার্নিকে জিগ্যেস করল চৌকিদার লোকটি কেমন।

'কে, মোহনলাল? ভেরি গুড ম্যান। সতর বছর চৌকিদারি করছে, কোনো দিন কেউ কমপ্লেন করেনি।'

ফেলুদা আরেকটু ভেবে বলল, 'কোনো জিনিস নেয়নি বলছিস?'

আমি বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললাম, আর সেই সঙ্গে এটাও বললাম যে রক্ষিত চৌকিদারের ছেলেকে সন্দেহ করছে।

'চলুন। লালমোহনবাবু—আপনি বলছেন লোকটা আপনার খাটে বসে খাট গরম করে দিয়েছিল— আপনার বাক্সে কী আছে একবার দেখে আসি। আমরা চলি, মিস্টার কুলকার্নি। এটা আপাতত আপনার জিম্মাতেই থাক।'

তোয়ালেতে মোড়া যক্ষীর মাথাটা ফেলুদা কুলকার্ণিকে দিয়ে দিল। তিনি সেটা তাঁর আপিসের সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে চাবি দিয়ে দিলেন। ফেলুদা বলে এল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।

বাংলোয় এসে আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর জিনিস খুব ভালো করে ঘেঁটে দেখল। জামাকাপড় ছাড়া লালমোহনবাবুর সুটকেসে যা ছিল তা হল একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, দু' খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, তাঁর নোটবুক, আর বেলুচিস্তানের বিষয়ে একটা ইংরেজি বই। নোটবুকটা ফেলুদা এতক্ষন ধরে উলটে পালটে দেখল কেন সেটা বুঝতে পারলাম না। সব দেখাটেখা হয়ে গেলে বলল, 'যা আন্দাজ করছি তা যদি ঠিক হয়, তা হলে এসপার ওসপার যা হবার আজই হবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে মনে হচ্ছে তোদের একটা জরুরী ভূমিকা নিতে হবে. সব সময় মনে রাখবি যে আমি আছি পেছনে, ভয়ের কিচ্ছু নেই। মল্লিকের অ্যারেস্টের কথা কাউকে বলবি না, এখন ঘর থেকে বেরোবি না। এমনিতেও হয়ত বেরোতে পারবি না, কারণ মনে হয় বৃষ্টি আসছে।'

ফেলুদা কথাগুলো বলতে বলতে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, এখন দেখলাম ও নিঃশব্দে হেঁটে জানালার কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল। আমারও চোখ গেল জানালার দিকে। এটা পশ্চিম দিক। এদিকে খানিক দূর ঘাস জমির পরে কতগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছটা আমার চেনা। একজন লোককে গাছপালার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ঘাস পেরিয়ে আমাদের বাংলোর সামনের দিকে চলে আসতে দেখলাম। তার এক মিনিট পরেই লোকটা আমাদের খাবার ঘরে ঢুকল, আর তার পরেই একটা দরজা চাবি দিয়ে খোলা, আর তারপর সেটাকে ভিতর থেকে বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

ফেলুদা দুবার মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলল— 'ঠিক আছে ঠিক আছে।'

লোকটা আর কেউ নন— আমাদের প্রতিবেশী মিস্টার রক্ষিত।

'আমার কাছ থেকে সময় মতো নির্দেশ পাবি, সেই অনুযায়ী কাজ করবি।'

এই শেষ কথাটুকু বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা দুজনে ঘরে বসে রইলাম। বাইরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। বোধহয় কালো মেঘে সূর্যটা ঢেকে দিয়েছে বলে আলো কমে এসেছে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, মিস্টার রক্ষিতের চেয়ে বেশি রহস্যময় লোক আর কেউ নেই, কারণ ওর সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানতে পারিনি।

আর মল্লিক? মল্লিক সম্বন্ধেও কি সব জেনে ফেলেছি?

জানি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে যে অন্ধকারে ছিলাম, এখনো সেই অন্ধকারেই আছি।

১০

বারোটার পর থেকেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল, আর তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। ফেলুদা বলে গেছে আজকেই ক্লাইম্যাক্স, আর তাতে আমাদের হয়ত একটা ভূমিকা নিতে হবে। আমার কাছে সবই অন্ধকার, লালমোহনবাবুর কাছেও তাই। কাজেই ভূমিকাটা যে কী হতে পারে সেটা ভেবে কোনো লাভ নেই মল্লিক অ্যারেস্টেড, যক্ষীর মাথা সিন্দুকে বন্দী, এর পরেও যে আর কী ঘটনা থাকতে পারে সেটা ভেবে বার করার সাধ্যি নেই।

একটার সময় চৌকিদার এসে বলল খানা তৈয়ার হ্যায়। ফেলুদাকে ছাড়াই খেতে গেলাম। সে নিশ্চয়ই গেস্ট হাউসের বাবুর্চির রান্না খাচ্ছে। আমরা দুজনে টেবিলে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিস্টার রক্ষিতও এসে পড়লেন। সকালে তাকে গোমড়া মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি বেশ স্বাভাবিক মেজাজ। বললেন, এমন দিনে চাই খিচুড়ি। বাংলাদেশের খিচুড়ি কি আর এরা করতে জানে? সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, ডিমের বড়া, বেগুনী এ খাওয়ার জুড়ি নেই। এলাহাবাদেও আমি বাংলাদেশের অভ্যাস ছাড়িনি।' ভদ্রলোক যে খেতে ভালোবাসেন সেটা বেশ বোঝা যায়। লালমোহনবাবুও তাঁর চেহারার অনুপাতে ভালই খান, তবে এখানের চালে কাঁকরটা তাঁর একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। দাঁতে পড়লেই এমন ভাব করছেন যেন মাথায় বাজ পড়ল।

ডালটা শেষ করে যখন মাংসটা পাতে ঢেলেছি তখন একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। আর তারপরেই খ্যানখ্যানে গলায় 'চৌকিদার' বলে একটা হাঁক। চৌকিদার ব্যস্তভাবে একটা ছাতা নিয়ে বাইরে চলে গেল। মিস্টার

রক্ষিত হাতের রুটিতে মাংস পুরে মুখে দিয়ে বললেন, 'এই দুর্যোগের দিনে আবার টুরিস্ট।'

সাদা গোঁফ সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা চশমা পরা একজন ভদ্রলোক বর্ষাতি খুলতে খুলতে ভেতরে এসে ঢুকলেন। পিছনে চৌকিদার, তার হাতে কুমীরের চামড়ার একটা আদ্যিকালের সুটকেস। ভদ্রলোক হিন্দিতে বলে দিলেন তিনি লাঞ্চ করে এসেছেন, তার জন্যে আর কোনো হ্যাঙ্গামা করতে হবে না।



তারপর আমাদের দিকে ফিরে বাংলায় বললেন, 'কাকে নাকি অ্যারেস্ট করেছে শুনলাম?'

ফেলুদার বারণ, তাই আমরা বোকার মতো চুপ করে রইলাম। রক্ষিত যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কাকে? কখন?

'সাম ভ্যান্ডাল। গুহার ভেতর থেকে মূর্তির মুন্ডু ভেঙে নিচ্ছিল—ধরা পড়েছে। অ্যাদ্দুর এসে যদি দেখি কেভে ঢুকতে দিচ্ছে না তাহলেই ত চিত্তির। আপনারা এখনো কিছু শোনেন নি?'

রক্ষিত বললেন, 'এখনো খবরটা এসে পৌঁছয়নি বাংলোয়।'

'এনিওয়ে—ধরা যে পড়েছে সেইটেই বড় কথা। এখানকার পুলিশের এলেম আছে বলতে হবে।'

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে ঢুকে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি শুনলাম তিনি আপন মনে বকবক করছেন। ছিটগ্রস্ত।

আড়াইটে নাগাদ বৃষ্টি থামল।

তিনটের কিছু পরে পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখলাম সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দূরের ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরে দেখলাম তিনি ফিরে আসছেন।

প্রায় সাড়ে চারটের সময় যখন চা নিয়ে এলো তখন হঠাৎ খেয়াল করলাম যে দরজার সামনে মেঝেতে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ পড়ে আছে। খুলে দেখলাম সেটা ফেলুদার মেসেজ—

'পনের নম্বর গুহায় যাবি সন্ধ্যা সাতটায়। দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অপেক্ষা করবি।'

ফেলুদা নেপথ্যে থেকে ক্যামপেন চালিয়ে যাচ্ছে। এ এক নতুন ব্যাপার বটে।

এ জিনিস এর আগে কখনো হয়নি।

বৃষ্টি আর নামেনি। সাড়ে ছ'টায় যখন বাংলো থেকে বেরোচ্ছি তখন ফ্রেঞ্চকাট আর রক্ষিত দু-জনেই যে-যার ঘরে রয়েছে, কারণ দুটো ঘরেই বাতি জ্বলছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বার আষ্টেক বিড়বিড় করে দুর্গা দুর্গা বললেন। আমার নিজের মনের ভাব আমি লিখে বোঝাতে পারবনা, তাই চেষ্টাও করব না। হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই পকেটের ভেতর গুঁজে দিলাম।

সাতটা বাজতে দশ মিনিটে আমরা কৈলাসের কাছে পৌঁছলাম। পশ্চিমের আকাশে এখনো যথেষ্ট আলো রয়েছে, কারণ জুন মাসে এখানে সাড়ে ছ'টার পরে সূর্যাস্ত হয়। যে দিকে পাহাড় আর গুহা সেদিকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, তবে আকাশে মেঘ নেই।

আমরা কৈলাস থেকে ডানদিকে মোড় নিলাম। পরের গুহাটাই পনের নম্বর গুহা। দশাবতার গুহা। খাদের উপর থেকে এরই সামনে ফেলুদা নুড়ি পাথর ফেলেছিল।

গুহার সামনে পাহারা নেই। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে একটা প্রকাণ্ড চাতাল, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট মন্দির। আশেপাশে দেখার সময় নেই, তাই আমরা চাতাল পেরিয়ে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গুহার মধ্যে ঢুকলাম।

এটা নিচের তলা। আমাদের যেতে হবে দোতলায়। সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু এখনো তার প্রয়োজন হচ্ছে না। উত্তর-পশ্চিম কোণে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আর কেউ গুহার মধ্যে আছে কিনা জানি না, তাই যতটা সম্ভব শব্দ না করে আমরা দোতলায় উঠতে লাগলাম।

দেড়তলায় উঠে একটা খোলা জায়গা। সেখানে দেয়ালের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। আরো খানিকটা উঠে গিয়ে আমরা তিনদিক বন্ধ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে পৌঁছলাম। সারি সারি কারুকার্য করা থাম হলের ছাতটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দক্ষিণের দেয়ালে আশ্চর্য সব পৌরাণিক দৃশ্য খোদাই করা।

ফেলুদার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে এগিয়ে চললাম। এদিকটা ক্রমে আলো থেকে দূরে সরে এসেছে, তাই টর্চ জ্বালতে হল। নিশ্চয় আর কেউ নেই, অন্তত শত্রুপক্ষের কেউ নেই, না হলে ফেলুদা আমাদের আসতে বলত না—এই ভরসাতেই আমরা টর্চ জ্বেলেছি। ওই যে থামের ডানদিকের পিছনে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ঘুপচি কোণ।

আমরা এগিয়ে গেলাম। নিচে সিঁড়ি ওঠার আগেই পা থেকে স্যান্ডাল খুলে নিয়েছিলাম, এখন দেখছি পাথর বেশ ঠাণ্ডা। জায়গায় পৌঁছে আবার স্যান্ডাল পরে নিলাম। তেরশো বছর আগে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি খোদাই করা পৌরাণিক দৃশ্যে ভরা গুহার ভেতর কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার কোনো ধারণা এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না; একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে পা ধরে যাবে বলে আমরা দুজনেই গুহার কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছি, এমন সময় একটা জিনিসে চোখ পড়াতে বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল।

আমাদের সামনে হাত পাঁচেক দূরে একটা থামের পাশে আবছা অন্ধকারে একটা আলগা জিনিস পড়ে আছে। একটা লাল রঙের জিনিস। আর তার তলায় চাপা দেওয়া একটা চৌকো সাদা জিনিস।

লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'একটা কাগজ বলে মনে হচ্ছে।'

দুজনে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মাথাটা বেশ কয়েকবার ঘুরে গেল, আর সেই সঙ্গে রহস্যটাও আরো ভালো ভাবে জট পাকিয়ে গেল।

তলার জিনিসটা কাগজই বটে, আর পেপার ওয়েট-টা হল — ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা! —যেটা আজই সকালে মল্লিকের সুটকেস থেকে বেরিয়ে কুলকার্নির সিন্দুকে লুকিয়ে ছিল।

অন্ধকার বেশ বেড়েছে, তাই কাগজের লেখাটা পড়তে আবার টর্চ জ্বালতে হল।—

'মাথাটা আপনার কাছে রাখুন। চাইলে দিয়ে দেবেন।'

এটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে। লালমোহনবাবু ধরা গলায় 'জয় মা তারা' বলে মাথাটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বগলদাবা করে নিজের জায়গায় নিয়ে এলেন। আমি কাগজটা পকেটে পুরলাম।

বাইরে ফিকে চাঁদের আলো। থামের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের আকাশ দেখা যাচ্ছে, সে আকাশের রঙ এখন আশ্চর্যরকম বেগুনী।

ক্রমে সে রঙ বদলালো। চাঁদ বোধহয় বেশ ভালো ভাবে উঠেছে। গুহার মধ্যে জমাট বাঁধা অন্ধকারটা আর নেই।

'আটটা!'—লালমোহনবাবু যেন অনেকক্ষণ চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে কথাটা বললেন।

একটা অতি ক্ষীণ শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পা ফেলছে। এইবার শব্দ বদলালো। এবার সমতল মেঝেতে হাঁটছে। এবারে দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল। লোকটা থেমেছে—এদিক ওদিক

দেখছে। একটা খচ্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইটার জ্বলে উঠল। এক সেকেণ্ডের আলো, কিন্তু তাতেই মুখ চেনা হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মল্লিক।

আবার মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এবার যদি মরা মানুষ শুভঙ্কর বোসও এসে হাজির হন তাহলেও আশ্চর্য হব না।

মল্লিক এগিয়ে এলেন, তবে আমাদের দিকে নয়। তিনি অন্য দিকের কোণে যাচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব দিক। ওদিকে গাঢ় অন্ধকার। ভদ্রলোক সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আব আমার মন বলছে — ফেলুদা কোথায়?....ফেলুদা কোথায়?....ফেলুদা কোথায়?....লালমোহনবাবুকে বাক্স রহস্যের ঘটনার পর বলেছিলেন ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেবেন, কারণ বাস্তব জীবনে বানানো গল্পের চেয়ে অনেক বেশি অবিশ্বাস্য আর রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটে। এই যক্ষীর মাথার ঘটনার পরে উনি কী বলবেন কে জানে!

চাঁদের আলো বেড়েছে। দূরে একটা কুকুর ডাকল। তারপর আরেকটা। তারপর থমথমে চুপ।

তারপর আরেকটা শব্দ।

আরেকজন উঠছে সিঁড়ি দিয়ে।

এবার মেঝে দিয়ে হাঁটছে। এবার দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তাকে। এখনো চেনা যাচ্ছে না। এবার সে লোক এগিয়ে এল। এবার আমাদেরই দিকে। প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। এক পা এক পা করে।

হঠাৎ চোখের সামনে চোখধাঁধানো আলো। লোকটা টর্চ জ্বেলেছে। শুধু টর্চই দেখছি, লোকটাকে দেখছি না। টর্চটা আমাদের ওপব ফেলা; সেটা এগিয়ে এল। থামল। তারপব একটা চেনা গলার স্বর—চাপা, কিন্তু কথাগুলো ভীষণ স্পষ্ট—

'বামন হয়ে চাঁদে হাত? অ্যাঁ, বাছাধন? আবার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখতে শেখা হয়েছে? —দশাবতার গুহায় আটটার সময় আসিবেন....সঙ্গে পাঁচশত টাকা আনিবেন.... তবে আপনার যাহা খোয়া গিয়াছে তাহা পাইবেন, নতুবা....এসব কোত্থেকে শেখা হল, ইতিহাসের অধ্যাপক? কথাগুলো কানে ঢুকছে না, এখনো কালা সেজে বসে আছ? এই ব্যাপারে তুমি জড়ালে কী করে? খাতায় আবার নোট করা রয়েছে দেখলাম— ফকার ফ্রেন্ডশিপ ক্র্যাশ, ভুবনেশ্বরের যক্ষী, কৈলাসের মন্দির, প্লেনের টাইম........। আবার সঙ্গে একটা

নাবালককে রেখেছ কেন? ওকি তোমার বডিগার্ডি? আমার ডান হাতে কী আছে দেখতে পাচ্ছ কি?

মিস্টার রক্ষিত। এক হাতে পিস্তল, এক হাতে টর্চ।

লালমোহনবাবু দুবার 'আমি' 'আমি' বলে থেমে গেলেন।

রক্ষিতের চাপা হুম্‌কিতে গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠল—

'আমি আমি ছাড়! আসল মাল কোথায়?'

'এই যে। আপনার জন্যই......'

লালমোহনবাবু যক্ষীর মাথাটা রক্ষিতের দিকে এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক পিস্তলের হাত ঠিক রেখে, টর্চের হাত দিয়ে মাথাটাকে বগলদাবা করে নিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'এসব ব্যবসা সকলকে মানায় না, বুঝেছ? যেমন ছোট মুখে বড় কথা মানায় না, তেমনি ছোট বুকে বড় সাধ মানায় না।'

মিস্টার রক্ষিতের কথা হঠাৎ থেমে গেল। কারণ, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে গুহার ভিতর।— বাইরের দিক থেকে একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী গুহার ভিতর ঢুকে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে, আর তার ফলে কালো কালো থামগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে আসছে।

সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ গম্‌গমে গলার স্বর শোনা গেল। ফেলুদার গলা। পাথরের মতো ঠান্ডা আর কঠিন সে গলা—

'মিস্টার রক্ষিত, আপনার দিকে, একটি নয়, এক জোড়া পিস্তল সোজা তাগ করা রয়েছে। আপনি নিজের পিস্তলটা নামিয়ে ফেলুন।'

'কী ব্যাপার? এসবের অর্থ কী? মিস্টার রক্ষিত কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'অর্থ খুবই সহজ' ফেলুদা বলল— 'আপনার অপরাধের শাস্তি দিতে এসেছি আমরা। অপরাধ একটা নয়—অনেকগুলো। প্রথম হল—ভারতের অমূল্য শিল্পসম্পদকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা; দ্বিতীয়, এই শিল্পসম্পদকে অর্থের লোভে বিদেশীদের কাছে বিক্রী করা, আর তৃতীয়-শুভঙ্কর বোসকে নির্মমভাবে হত্যা করা।'

'মিথ্যে! মিথ্যে!'—রক্ষিত চিৎকার করে উঠলেন।— 'শুভঙ্কর বোস খাদের উপর থেকে পা হড়কে ......'

'মিথ্যেটা আমি বলছি না, বলছেন আপনি। যে শাবল দিয়ে আপনি তাকে মেরেছিলেন সেই শাবল রক্তমাখা অবস্থায় খাদ থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা মনসার ঝোপের ভিতর পাওয়া গেছে। শুভঙ্কর বোস জ্যান্ত অবস্থায় খাদে পড়লে তিনি নিশ্চয়ই চিৎকার করতেন; অথচ কৈলাসের পাহারাদার

কোনো চিৎকার শোনেনি। আর তাছাড়া আপনার একটা নীল সার্ট আপনি বাংলোর পূর্বদিকে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। সেটা আমিই গিয়ে উদ্ধার করি। এই সার্টের একটা অংশ ছেঁড়া। মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে শুভঙ্কর বোসের-'

মিস্টার রক্ষিত হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই নিমেষের মধ্যে তিনজন জাঁদরেল লোকের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন। ডানদিকে জয়ন্ত মল্লিকের টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম মেক-আপ ছাড়া ফেলুদাকে, মিস্টার ঘোটেকে, আর আরেকটি লোক, যে মিস্টার ঘোটের হুকুমে রক্ষিতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ফেলুদা এবার জয়ন্ত মল্লিকের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার মল্লিক, এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ওই যে পিছনের গুহাটা দেখছেন, ওর মধ্যে গিয়ে দেখুন, বাঁদিকের কোণায় মিস্টার রক্ষিতেব রেনকোটটা রয়েছে। ওটা নিয়ে আসুন। আয় তপ্‌শে— এই ধোঁয়ার মধ্যে বেশিক্ষন থাকা চলবে না। আসুন লালমোহনবাবু।''

গেস্টহাউসের ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার খেতে খেতে ফেলুদা আমাদেব মনেব ধোঁযা দূর করছে। আমরা তিনজন ছাড়া রয়েছে মিস্টার মল্লিক, কুলকার্নি আর ঘোটে। হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে কথা হচ্ছে, আমি সেটা বাঙলাতেই লিখছি। ফেলুদা বলল—

'প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার রক্ষিতের আসল নাম হল চট্টোরাজ। উনি একটি গ্যাঙ বা দলের সভ্য, যার ঘাঁটি হল দিল্লি। এই দলের উদ্দেশ্য হল ভারতের ভালো ভালো মন্দির থেকে মূর্তি বা মূর্তিব মাথা ভেঙে নিয়ে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করা। এই ধরনের দল হয়ত আরো আছে। আপাতত এই একটি দলকে সায়েস্তা করার রাস্তা আমরা পেয়েছি, কারণ চট্টোরাজকে আমরা এই ঘাঁটিব হদিস এবং এর অন্যান্য সভ্যদের নাম বলতে বাধ্য করেছি। ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা চট্টোরাজই চুবি করেন, চট্টোরাজই সেটা কলকাতায় আনেন, চট্টোরাজই সেটা সিলভারস্টাইনের কাছে বিক্রি করেন, আবার প্লেন ক্র্যাশ হবার পর চট্টোরাজই সিদিকপুরে গিয়ে পানু নামক ছেলেটির কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে সেটা উদ্ধার করে আনেন, এবং সেই মূর্তি সমেত চট্টোরাজই ল্যুইসনকে ধাওয়া করে এলোরায় আসেন। এখানে আসার কারণ হল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। এক পাখি হল ল্যুইসনের কাছে সেটা বিক্রি করা, আর দ্বিতীয় হল কৈলাস থেকে আরেকটি কোনো টাট্‌কা নতুন মাথা

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা জানি এই দুটোর একটা উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। ল্যুইসন মূর্তি কিনতে রাজী হন, কিন্তু সেটা তাকে দেবার আগেই চট্টোরাজের হাতছাড়া হয়ে যায়, ফলে তাকে ল্যুইসনের গালিগালাজ শুনতে হয। আর মূর্তি চুরির ব্যাপারটা ভন্ডুল হয় একবার শুভঙ্কর বোসের অতর্কিত আবির্ভাবে, আর তার কিছু পরেই দশাবতার গুহার সামনে একটি নুড়ি পাথর ফেলার দরুণ।'



ফেলুদা বোধহয় দম নেবার জন্য চুপ করল। আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। আমি না বলে পারলাম না—'আর মিস্টার মল্লিক?'

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, 'মিস্টার মল্লিকের ব্যাপারটা খুবই সহজ। এতই সহজ যে প্রথমে আমিও ধরতে পারিনি। মিস্টার মল্লিক চট্টোরাজকে ধাওয়া করছিলেন।'

'কেন?'

'যে কারণে আমি মিস্টার মল্লিককে ধাওয়া করছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে। অর্থাৎ তিনিও মূর্তিটাকে উদ্ধাব করতে চাচ্ছিলেন অবিশ্যি এইখানেই মিলের শেষ নয়। ওঁব আব আমার পেশাও এক। উনিও আমাবই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

আমি অবাক হয়ে মিস্টার মল্লিকেব দিকে চাইলাম। ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি, তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে।

ফেলুদা বলে চলল, 'আমবা ফোন করে জেনেছি উনি বম্বের ভার্গব এজেন্সি নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। এই কোম্পানির মালিক বাঙালী, নাম ঘোষ। এদেরই একটা তদন্তের ব্যাপারে মল্লিক কিছুদিন হল কলকাতায আসেন, ওর এক বন্ধুব অবর্তমানে কুইনস ম্যানসনে তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন, তার গাড়ি ব্যবহার করেন। এই সব এজেন্সি সাধারনত মামুলি অপরাধের তদন্ত করে থাকে। কিন্তু মিস্টার মল্লিকের তাতে মন ভরছিল না। তিনি চাইছিলেন গোয়েন্দা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে। তাই না, মিস্টার মল্লিক?'

মিস্টার মল্লিক বললেন, 'ঠিক কথা। আর সেই সুযোগটা এসে যায় খুব আশ্চর্যভাবে। তদন্তের ব্যাপারেই গত বিষ্যুদবার গিয়েছিলাম নগরমলের দোকানে। সেখানে আমারই সামনে একটি মার্কিন ভদ্রলোক নগরমলকে একটা মূর্তির মাথা দেখালেন। আমার আর্ট সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান আছে, কিন্তু

মাথাটা তখন আমার মনে কোনো দাগ কাটেনি। শুধু জেনেছিলাম যে সাহেবের নাম সিলভারস্টাইন, আর উনি অত্যন্ত ধনী। পরদিন সকালে কাগজে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খবরটা পড়ি, আর তার আধ ঘন্টার মধ্যে রেডিওতে শুনি যে সিলভারস্টাইন সিদিকপুরের কাছে প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে। তখনই মনে হয় মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে পারলে আমার নাম হতে পারে। সেকথা তক্ষুনি বম্বেতে ফোন করে আমার বস্‌কে জানিয়ে দিই। উনি তাতে রাজী হন। বলেন—কী হয় আমাকে ফোন করে জানিও। আমি কাজে লেগে যাই। কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। আমি সিদিকপুরে পৌঁছানর পাঁচ মিনিট আগে আরেকটি ভদ্রলোক গিয়ে গ্রামের ছেলেদের কাছ থেকে মূর্তি আদায় করে নেন। ঘটনাটা ঘটে আমার চোখের সামনে, কিন্তু তখন আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। আমি ঠিক করি ভদ্রলোক ফলো করব। কিন্তু-'

'ভদ্রলোকের গাড়ির রংটা মনে আছে?'— ফেলুদা মল্লিকের কথার উপর প্রশ্ন করল।

'আছে বৈকি। নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি। সেটাকে ফলো করলাম, কিন্তু সেখানেও ব্যাড লাক্‌ --বারাসতের কাছাকাছি টায়ার পাংচার হয়ে গেল, ভদ্রলোক তখনকার মতো আমার হাতছাড়া হয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষনে আমার গোঁ চেপে গেছে। আমি জানি উনি আবার মূর্তিটা বেচবেন। চলে গেলাম গ্র্যান্ড হোটেলে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের দেখা পেলাম, তাকে ধাওয়া করে রেলওয়ে আপিসে গিয়ে তার দেখাদেখি আওরঙ্গাবাদের টিকিট কিনলাম। তার হাতের ব্যাগের ওজন দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তখন পর্যন্ত মূর্তিটা বিক্রি করতে পারেননি। টিকিট কিনে বম্বেতে আমার আপিসে খবরটা জানিয়ে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'জানি। আপনি বলেছিলেন মেয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। বাপ যে আসলে চট্টোরাজ, আপনি নন, সেটা তখন বুঝতে পারিনি।'

মল্লিক বললেন। 'যাই হোক্‌ এখানে এসে প্রথম থেকেই আমি মূর্তিটা হাত করার সুযোগ খুঁজি। আমি জানতাম যে চোরাই মাল উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে যদি চোরকে ধরে দিতে পারি তাহলে আরো বেশি নাম হবে, কিন্তু সেটা সাহসে কুলোল না। যাই হোক —কাল রাত্রে কৈলাসের কাছে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। যখন দেখলাম একে একে বাংলোর সবাই ঘুরতে বেরিয়েছে, তখন বাংলোয় গিয়ে জমাদারের দরজা দিয়ে চট্টোরাজের ঘরে ঢুকে মাথাটা নিয়ে আসি'।

ফেলুদা বলল, 'আপনার পেছনেও যে একজন গোয়েন্দা লেগেছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কি?'

' মোটেই না, আর সেইজন্যই ত হঠাৎ ধরা পড়ে এত বোকা হয়ে গিয়েছিলাম?'

মিস্টার ঘোটে হো হো করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 'যখন দেখলাম আপনি এতখানি পথ ল্যুইসনের সঙ্গে গিয়েও তাকে মূর্তিটা গছাননি, তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম যে আপনি নির্দোষ। তার আগে পর্যন্ত, আপনি গোয়েন্দা জেনেও আপনার উপর থেকে আমার সবটুকু সন্দেহ যায় নি।'

'কিন্তু আপনি ত চট্টোরাজকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই না?' —প্রশ্ন করল মিস্টার মল্লিক।

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে সেটা ছিল শুধু একটা খট্কা। যখন দেখলাম একটা পুরনো সুটকেসে নতুন করে নাম লেখা হয়েছে আর এন রক্ষিত, তখনই সন্দেহ হল— নামটা ঠিক ত? তারপর কাল রাত্রে উনি রেনকোট পরে বেরিয়েছিলেন সে কথা লালমোহনবাবুর কাছে শুনি। পনের নম্বর গুহাতে একজন লোক ঢুকেছে সন্দেহ করে ওপর থেকে গুহার সামনে একটা নুড়ি পাথর ফেলি। ফলে অন্ধকারে লোকটা পালায়। ভেতরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পেছন দিকের একটা ছোট গুহায় দেখি রেনকোট, আর তার বিরাট স্পেশাল পকেটে হাতুড়ি, ছেনি আর নাইলনের দড়ি। আমি ওগুলো সেইখানেই রেখে আসি। বুজতে পারি চট্টোরাজ হলেন মূর্তিচোর। সেই রাত্রেই দেখলাম চট্টোরাজ তার·ঘরে পাগলের মতো কী জানি খুঁজছেন। পরদিন সকালে শুনলাম আপনি বম্বেতে টেলিফোন করেছেন—মেয়ে ভালো আছে। বুঝলাম মূর্তি এখন আপনার কাছে। অথচ মুশকিল এই যে, মূর্তিটা হাতছাড়া হলে আসল চোরকে সায়েস্তা করা যাবে না। তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হল।

'এদিকে শুভঙ্কর বোসের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। তার ডেডবডি দেখতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে নীল কাপড়ের টুকরো পাওয়া গেল। আপনি রাত্রে নীল সার্ট পরেছিলেন, কিন্তু এদিকে আমার সন্দেহ চট্টোরাজের উপর পড়েছে। আসলে আমারও আগে চট্টোরাজ পৌঁছেছিলেন ডেডবডির কাছে। উনিই নাড়ি দেখার ভান করে নিজের একটা নীল সার্ট থেকে ছেঁড়া টুকরো শুভঙ্করের হাতে গুঁজে দেন— কারণ শুভঙ্করের মৃত্যুর জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার প্রয়োজন ছিল। উনি নিজের সার্টটি অবিশ্যি পরে বাংলোর পশ্চিম দিকে

গাছপালায় ভর্তি একটা নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে রাখেন, আর আমি গিয়ে সেটা উদ্ধার করি।

'কিন্তু এত করেও যে সমস্যাটা বাকি রইল, সেটা হল কী করে চট্টোরাজকে ধরা যায়। একটা পথ পেলাম যখন শুনলাম যে কে জানি লালামোহনবাবুর ঘরে ঢুকে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে চট্টোরাজ, কারণ তারই একটি মূল্যবান জিনিস খোওয়া গেছে. লালমোহনবাবুর বাক্সে লালমোহনবাবুর নোটবই ছিল, এবং তাতে যক্ষীর মাথা, প্লেন ক্র্যাশ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এই খাতা চট্টোরাজ না পড়ে পারেন না এই আন্দাজে আমি লালমোহনবাবুর হাতের লেখা নকল করে চট্টোরাজকে যে চিঠিটা লিখলাম সেটার কথা জানেন। তার আগেই আমি চট্টোরাজকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জানিয়ে দিলাম যে মূর্তি চোর ধরা পড়েছে—'

'সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি!'—আমি আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ!'—ফেলুদা হেসে বলল।—'সেটা আমার দু নম্বর ছদ্মবেশ। তোদের কাছাকাছি থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস। যাই হোক—চিঠির টোপ উনি বেমালুম গিলে ফেললেন। এবং তার ফলে যে কী হল সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এবার এইটুকুই বলতে বাকি যে, এই যে গ্যাংটা ধরা হল, এর কৃতিত্বের অংশীদার ভার্গব এজেন্সির মিস্টার মল্লিক যাতে উপযুক্ত স্বীকৃতি পান সেটা আমি নিশ্চয় দেখব, আর—মিস্টার ঘোটের যাতে পদোন্নতি হয় সেটাও একান্তভাবে কামনা করব। মিস্টার কুলকার্নির ভূমিকাও যে সামান্য নয় সেটা বলাই বাহুল্য, আর সাহসের জন্য যদি মেডাল দিতে হয় তাহলে সেটা অবশ্যই পাবেন শ্রীমান তপেশ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী।'

সকলের হাততালি শেষ হলে জটায়ু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আমার বোমটা তাহলে আর কোনা কাজে লাগল না বলছেন?'

ফেলুদা চোখ গোল গোল করে বলল, 'সে কি মশাই—এত যে ধোঁয়া হল সেটা এলো কোত্থেকে? ওটা ত আর এমনি এমনি বোমা নয়— একেবারে তিনশো ছাপ্পান্ন মেগাটন খাস মিলিটারি স্মোক-বম্ব!'

টিনটোরেটোর যিশু



১

মঙ্গলবার ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একটি কলকাতার ট্যাকসি—নম্বর ডব্লিউ. বি. টি ৪১২২—বৈকুণ্ঠপুরের প্রাক্তন জমিদার নিয়োগীদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল।

দারোয়ান এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি বছর পঞ্চান্নর ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের রং ফরসা, চুল অবিন্যস্ত, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি, চোখে টিনটেড গ্লাসের চশমা, পরণে গাঢ় নীল টেরিলিনের সুট।

গাড়ির ড্রাইভার ক্যারিয়ারের ডালা খুলে একটি ব্রাউন রঙের সুটকেস বার করে ভদ্রলোকের পাশে রাখল।

'নিয়োগী সাহাব?' দারোয়ান প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। দারোয়ান সুটকেসটা তুলে নিল। 'আসুন, বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বাড়ির বর্তমান মালিক সৌম্যশেখর নিয়োগী দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে বায়ু সেবন করছিলেন। আগন্তুককে দেখে তিনি একটু সোজা হয়ে বসে নমস্কার করে সামনে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সৌম্যশেখরের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দৃষ্টির দুর্বলতা হেতু চোখে পুরু চশমা পরতে হয়েছে, এছাড়া শরীরে বিশেষ কোনো ব্যারাম নেই।

'আপনিই রুদ্রশেখর?'

আগন্তুক ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে কোটের বুক পকেট থেকে একটি পাসপোর্ট বার করে সৌম্যশেখরের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যশেখর সেটি হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে একটু হেসে বললেন, 'দেখুন কী কাণ্ড। আপনি আমার আপন খুড়তুতো ভাই, অথচ আপনাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে সেটা প্রমাণ করতে হচ্ছে। অবিশ্যি আপনাকে দেখলে নিয়োগী পরিবারের বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা সামান্য কৌতুকের আভাস দেখা গেল।

'তা যাকগে', পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললেন সৌম্যশেখর, 'আপনার রোম থেকে লেখা চিঠিটা পেয়ে আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আপনি পেয়েছিলেন আশা করি। আপনি যে অ্যাদ্দিন আসেন নি সেটাই আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কাকা ঘর ছেড়ে চলে যান ফিফটি ফাইভে, অর্থাৎ সাতাশ বছর আগে। থার্টি-এইটে কাকা যখন আপনাকে ছাড়াই দেশে ফিরলেন তখন অনুমান করেছিলুম আপনাদের দু'জনের মধ্যে খুব একটা বনিবনা নেই। কাকা অবিশ্যি এ নিয়ে কোনদিন কিছু বলেন নি, আর আমরাও জিগ্যেস করি নি। শুধু জানতুম যে তাঁর একটি ছেলে আছে রোমে। তা এখন যে এলেন, সেটা বোধ করি সম্পত্তির ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে ত' লিখেছিলুম যে বছর দশেক আগে অবধি মাঝে মাঝে একটা করে কাকার পোস্টকার্ড পেয়েছি। তারপর আর পাই নি। কাজেই আইনের চোখে তাঁকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া যায়। আপনি এ বিষয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা বেশ ত। আপনি ক'দিন থাকুন এখানে। সব দেখে-শুনে নিন। ওপরে কাকার স্টুডিও এখনো সেইভাবেই আছে। রং তুলি ছবি ক্যানভাস সবই আছে, আমরা কেউ হাত দিই নি। কী আছে না আছে সব দেখে নিন। ব্যাঙ্কের বই-টই সবই আছে। তবে, আপনাদের ইটালিতে কি রকম জানি না, আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে লেখাপড়া হতে হতে ছ'মাস লেগে যায়। আপনি সময় হাতে নিয়ে এসেছেন আশা করি?'

'হ্যাঁ।'

'মাঝে মাঝে ত কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে : ট্যাক্সিটা রেখে দিয়েছেন ত?'

'হ্যাঁ।'



'আপনার ড্রাইভারের থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে আমার লোক, কোনো অসুবিধা হবে না।'

'গ্রা—থ্যাঙ্কস।'

রুদ্রশেখর বলতে গিয়েছিলেন গ্রাৎসিয়া, অর্থাৎ ইটালিয়ান ভাষায় ধন্যবাদ।

'ইয়ে, আপনি আমাদের দিশি খাবারে অভ্যস্ত কি? লণ্ডনে ত শুনেছি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ, রোমেও আছে কি?'

'কিছু আছে।'

'বেশ, তাহলে আর চিন্তা নেই। গাঁয়ে দেশে আপনাকে যে হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে দেব তারও ত উপায় নেই। —কী, জগদীশ—কী হল?'

একটি বৃদ্ধ ভৃত্য দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে বোঝা যায় সে কোনো রকমে অশ্রু সংবরণ করে আছে।

'হুজুর, ঠুম্‌রী মরে গেছে!'

'মরে গেছে!'

'হাঁ হুজুর।'

'সেকি? ভিখু যে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল!'

'ওরা কেউ ফেরেনি। তাই খুঁজতে গেলাম। বাঁশবনে মরে আছে হুজুর। ভিখু পালিয়েছে।'

সংগীতপ্রিয় সৌম্যশেখরের দুটি ফক্স টেরিয়ারের একটির নাম ছিল ঠুম্‌রী, একটি কাজরী। কাজরী স্বাভাবিক কারণেই মারা গেছে দু বছর আগে। ঠুম্‌রীর বয়স হয়েছিল এগারো। তবে আজ বিকেল অবধি সে ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ।

সৌম্যশেখরকে প্রিয় কুকুরের শোকে বিহ্বল দেখে সদ্য রোম থেকে আগত রুদ্রশেখর নিয়োগী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এই বেলা তাঁর থাকার ঘরটা দেখে নিতে হবে।

২

শিবপুরের ট্র্যাফিক আর ঘন বসতি পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার সিক্স্‌ -এ আমাদের গাড়িটা পড়তেই যেন একটা নতুন জগতে এসে পড়লাম। আমাদের গাড়ি মানে রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর সবুজ অ্যামবাসাডার। গাড়ি কেনার পয়সা ফেলুদার নিজের কোনোদিন হবে বলে মনে হয় না। এ দেশের প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের রোজগারে গাড়ি বাড়ি হয় না। আমাদের রজনী সেন রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে ফেলুদা কিছুদিন থেকেই একটা নিজের ফ্ল্যাটে যাবার চিন্তা করছিল, বাবা সেটা জানতে পেরে এক ধমকে ফেলুদাকে ঠাণ্ডা করেছেন। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়', বললেন বাবা। 'যেই একটু রোজগার বেড়েছে অমনি নিজের ফ্ল্যাটের ধান্দা। পরে পসার কমলে যদি আবার সুড়সুড় করে এই কাকার ফ্ল্যাটেই ফিরে আসতে হয়? সেটার কথা ভেবেছিস কি?' তারপর থেকে ফেলুদা চুপ।

আর গাড়ির ব্যাপারে জটায়ুর ত আগে থেকেই বলা আছে। 'ধরে নিন আমার গাড়ি ইজ ইকুয়্যাল টু আপনার গাড়ি। আপনি আমার এত উপকার করেছেন, এই সামান্য প্রিভিলেজটুকু ত আপনার ন্যায্য পাওনা মশাই।'

উপকারের ব্যাপারটা লালমোহনবাবুর ভাষাতেই বলা ভালো। ওঁর জীবনের অনেকগুলো বন্ধ দরজা নাকি ফেলুদা এসে খুলে দিয়েছে। তাতে নাকি উনি শরীরে নতুন বল মনে নতুন সাহস আর চোখে নতুন দৃষ্টি পেয়েছেন। 'আর, কত জায়গায় ঘোরা হল বলুন ত আপনার দৌলতে—দিল্লী বোম্বাই কাশী সিমলা রাজস্থান সিকিম নেপাল—ওঃ! ট্র্যাভেল ব্রডন্‌স দি মাইণ্ড—এটা শুনে এসেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। এটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম ত আপনি আসার পর।'

এবারের ট্রাভেলটায় মনের প্রসার কতটা বাড়বে জানি না। ক্যালকাটা টু মেচেদা ভ্রমণ বলতে তেমন কিছুই নয়। তবে লালমোহনবাবুরই ভাষায় আজকাল কলকাতায় বাস করা আর ব্ল্যাক হোলে বাস করা নাকি একই

জিনিস। সেই ব্ল্যাক হোল থেকে একটি দিনের জন্যও যদি বাইরে বেরিয়ে আসা যায় তাহলে খাঁটি অক্সিজেন পেয়ে মানুষের আয়ু নাকি কমপক্ষে তিন মাস বেড়ে যায়।

অনেকেই হয়ত ভাবছে এত জায়গা থাকতে মেচেদা কেন। তার কারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাস তিনেক হল এঁর কথা কাগজে পড়ার পর থেকেই লালমোহনবাবুর রোখ চেপেছে এঁর সঙ্গে দেখা করার।

এই ভবেশ ভটাচায্ নাকি সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে লোকেদের নানা রকম অ্যাডভাইস দিয়ে তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বড় বড় ব্যবসাদার, বড় বড় কোম্পানির মালিক, খবরের কাগজের মালিক, ফিল্মের প্রযোজক, বইয়ের প্রকাশক, উপন্যাসের লেখক, উকিল, ব্যারিস্টার, ফিল্মস্টার—সব রকম লোক নাকি এখন তাঁর মেচেদার বাড়ির দরজায় উকি দিচ্ছে। জটায়ুর শেষ উপন্যাসের কাটতি আগের তুলনায় কম—এক মাসে তিনটে এডিশনের বদলে দুটো এডিশন হয়েছে। জটায়ুর বিশ্বাস উপন্যাসের নামে গণ্ডগোল ছিল, তাই এবার ভটচায মশাইয়ের অ্যাডভাইস নিয়ে নতুন বইয়ের নামকরণ হবে, তারপর সেটা বাজারে বেরুবে। ফেলুদার মত অবিশ্যি আলাদা। গত উপন্যাসটা পড়েই ফেলুদা বলেছিল রংটা বেশি চড়ে গেছে।—'সাত-সাতটা গুলি খাওয়া সত্ত্বেও আপনার হিরোকে বাঁচিয়ে রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, লালমোহনবাবু?'

'কী বলছেন মশাই! একি যেমন-তেমন হিরো? প্রখর রুদ্র ইজ এ সুপার-সুপার-সুপারম্যান' ইত্যাদি। এবারের গল্পটা ফেলুদার মতে বেশ জমেছে, নামের রদবদলে বিক্রীর এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাও লালমোহনবাবু একবার সংখ্যাতাত্ত্বিকের মত না নিয়ে ছাড়বেন না। তাই মেচেদা।

ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্স খুব বেশিদিন হল তৈরি হয়নি। এই রাস্তাই সোজা চলে গেছে বম্বে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ধারে যেমন সব প্রাচীন গাছ দেখা যায়, এখানে তা একেবারেই নেই। বাড়ি-ঘরও বেশি নেই, চারিদিক খোলা, আশ্বিন মাসের প্রকৃতির চেহারাটা পুরোপুরি পাওয়া যায়। ড্রাইভার হরিপদবাবু স্পীডোমিটারের কাঁটা আশি কিলোমিটারে রেখে দিয়ে দিব্যি চালাচ্ছেন গাড়ি। কলকাতা থেকে মেচেদা যেতে লাগবে দু'ঘণ্টা। আমরা বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায়; কাজ সেরে দেড়টা-দুটোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারব।

কোলাঘাট পেরিয়ে মিনিট তিনেক যাবার পরেই একটা উদ্ভট গাড়ির দেখা পেলাম যেটা রাস্তার একপাশে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মালিক করুণ মুখ

করে দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির পাশেই। আমাদের আসতে দেখে ভদ্রলোক হাত নাড়লেন, আর হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

'একটা বিশ্রী গোলমালে পড়েছি মশাই,' রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন ভদ্রলোক। 'টায়ারটা গেছে, কিন্তু জ্যাকটা বোধহয় অন্য গাড়িতে রয়ে গেছে, হেঁ হেঁ....'

'আপনি চিন্তা করবেন না,' বললেন লালমোহনবাবু। 'দেখত, হরিপদ।'

হরিপদবাবু জ্যাক বার করে নিজেই ভদ্রলোকের গাড়ির নিচে লাগিয়ে সেটাকে তুলতে আরম্ভ করে দিলেন।

'আপনার এ গাড়ি কোন ইয়ারের?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

''থার্টি-সিক্স,' বললেন ভদ্রলোক, 'আর্মষ্ট্রং সিড্‌লি।''

'লঙ রানে কোনো অসুবিধা হয় না?'

'দিব্যি চলে। আমার আরো দুটো পুরোন গাড়ি আছে। ভিনটেজ কার র‍্যালিতে প্রতিবারই যোগ দিই আমি। ইয়ে, আপনারা চললেন কতদূর?'

'মেচেদায় একটু কাজ ছিল।'

'কতক্ষণের কাজ?'

'আধ ঘণ্টাখানেক।'

'তাহলে একটা কাজ করুন না। ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। মেচেদা থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরবেন—মাত্র আট কিলোমিটার। বৈকুণ্ঠপুর।'

'বৈকুণ্ঠপুর?'

'ওখানেই পৈত্রিক বাড়ি আমাদের। আমি অবিশ্যি থাকি কলকাতায়। তবে মা-বাবা ওখানেই থাকেন। দুশো বছরের পুরনো বাড়ি। আপনাদের খুব ভালো লাগবে। দুপুরে আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে চলে আসবেন। আপনারা আমার যা উপকার করলেন! কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত জানি না।'

ফেলুদা একটু যেন অন্যমনস্ক। বলল, 'বৈকুণ্ঠপুর নামটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেণ্টলি?'

'ভুবন সিং-এর লেখাতে কি? ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলিতে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মাস দেড়েক আগে বেরিয়েছিল।'

'আমি শুনেছি লেখাটার কথা, কিন্তু পড়া হয়নি।'

ইলাস্‌ট্রেটেড উইকলি আমাদের বাড়িতে আসে না। ফেলুদা কোথায় পড়েছে জানি। হেয়ার কাটিং সেলুনে। একটা বিশেষ সেলুনে ও যায় আর ইয়াসিন নাপিত ছাড়া কাউকে দিয়ে চুল কাটায় না। ইয়াসিন যতক্ষণ ব্যস্ত থাকে ফেলুদা ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ে।

'বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগী পরিবারের একজনকে নিয়ে লেখা', বলল ফেলুদা, ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন। রোমে গিয়ে আঁকা শিখেছিলেন।'

'আমার দাদু চন্দ্রশেখর', হেসে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি ওই পরিবারেরই ছেলে। আমার নাম নবকুমার নিয়োগী।'

'আই সী। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, আর ইনি আমার খুড়তুতো ভাই তাপশ।'

প্রদোষ মিত্র শুনে ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে ত আপনাদের আসতেই হবে। আপনি ত বিখ্যাত লোক মশাই। সত্যি বলতে কি, এর মধ্যে আপনার কথা মনেও হয়েছিল একবার।

'কেন বলুন ত?'

'একটা খুনের ব্যাপারে। আপনি শুনলে হাসবেন, কারণ ভিকটিম মানুষ নয়, কুকুর।'

'বলেন কি! কবে হল এ খুন?'

'গত মঙ্গলবার। আমাদের একটা ফক্স টেরিযার। বাবার খুবই প্রিয় কুকুর ছিল।'

'খুন মানে?'

'চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আব ফেরেনি। চাকবও ফেরেনি। কুকুরের লাশ পাওয়া যায় বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূবে, একটা বাঁশবনে। মনে হয় বিষাক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। বিস্কিটেব গুঁড়ো পড়েছিল আশে পাশে।'

'এতো অদ্ভুত ব্যাপাব। এব কোনো কিনারা হয়নি?'

'উহুঁ। কুকুরের বয়স হয়েছিল এগারো। এমনিতেই আর বেশিদিন বাঁচত না। আমার কাছে ব্যাপারটা তাই আরো বেশি মিস্টিবিযাস বলে মনে হয। যাই হোক, আপনাকে অবিশ্যি এ নিয়ে তদন্ত করতে হবে না, কিন্তু আপনারা এলে সত্যিই খুশি হব। দাদুর স্টুডিও এখনো বয়েছে, দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে,' বলল ফেলুদা। 'আমারও লেখাটা পড়ে যথেষ্ট কৌতূহল হয়েছিল নিয়োগী পরিবার সম্বন্ধে। আমরা কাজ সেরে সাড়ে দশটা নাগাদ গিয়ে পড়ব।'

'মেচেদার মোড় থেকে দু-কিলোমিটার গেলে একটা পেট্রল পাম্প পড়ে। সেখানে জিগ্যেস করলেই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তা বাতলে দেবে

টায়ার লাগানো হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ি আরো স্পীডে যাবে বলে ভদ্রলোক আমাদেরই আগে যেতে দিলেন। গাড়ি রওনা হবার পর ফেলুদা

বলল, 'কত যে ইন্টারেস্টিং বাঙালী চরিত্র আছে যাদের নামও আমরা জানি না। এই চন্দ্রশেখর নিয়োগী বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চব্বিশ বছর বয়সে রোমে চলে যান ওখানকার বিখ্যাত অ্যাকাডেমিতে পেন্টিং শিখতে। ছাত্র থাকতেই একটি ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসেন। এখানে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে খুব নাম হয়। নেটিভ স্টেটের রাজা-রাজড়াদের ছবি আঁকতেন। একটি রাজার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়। তিনিই লিখেছেন প্রবন্ধটা। প্রৌঢ় বয়েসে আঁকাটাকা সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান।'

'আপনি বলছেন চন্দ্রশেখরের কথা। আর আমি ভাবছি কুকুর খুন,' বললেন লালমোহনবাবু। 'এ জিনিস শুনেছেন কখনো?'

ফেলুদা স্বীকার করল সে শোনে নি।

'লেগে পড়ুন, মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু, 'শাঁসালো মক্কেল। তিন তিনখানা ভিনটেজ গাড়ি। হাতের ঘড়িটা দেখলেন? কমপক্ষে ফাইভ থাউজ্যাণ্ড চিপস। এ দাঁও ছাড়বেন না।'

■ ৩ ■

ভবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পোস্টকার্ডে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, তাই তার দর্শন পেতে দেরি হল না। ইস্কুল মাস্টার টাইপের চেহারা চোখে মোটা চশমা, গায়ে ফতুয়ার উপর একটা এণ্ডির চাদর, বসেছেন তক্তপোষে, সামনে ডেস্কের উপর গোটা পাঁচেক ছুঁচলো করে কাটা পেনসিল, আর একটা খোলা খেরোর খাতা।

'লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়?' —পোস্টকার্ডে নামটা পড়ে জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। 'বয়স কত হল?'

লালমোহনবাবু বয়স বললে। 'জন্মতারিখ'?— 'ঊনত্রিশে শ্রাবণ'।

'হুঁ...সিংহ রাশি। তা আপনার জিজ্ঞাস্যটা কী?'

'আজ্ঞে আমি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে উপন্যাস লিখি। আমার আগামী উপন্যাসের তিনটি নাম ঠিক করা আছে। কোনটা ব্যবহার করব যদি বলে দেন।'

'কী কী নাম?'

''কারাকোরামে রক্ত কার?'', ''কারাকোরামের মরণ কামড়'', আর 'নরকের নাম কারাকোরাম''।

''হুঁ। দাঁড়ান।''

ভদ্রলোক নামগুলো খাতায় লিখে নিয়ে কিসব যেন হিসেব করলেন, তার মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই আছে। তারপর বললেন, 'আপনার নাম

থেকে সংখ্যা পাচ্ছি একুশ, তিন দুগণে ছয়। অর্থাৎ তিনের গুণণীয়ক না হলে ফল ভালো হবে না। আপনি তৃতীয় নামটাই ব্যবহার করুন। তিন আঠারং চুয়ান্ন। কবে বেরোচ্ছে বই?'

'আজ্ঞে পয়লা জানুয়ারী ।'

'উঁহু। তেসরা করলে ভালো হবে, অথবা তিনের গুণনীয়ক যে-কোনো তারিখ।'

'আর, ইয়ে—বিক্রীটা—?'

'বই ধরবে।'

একশোটি টাকা খামে পুরে দিয়ে আসতে হল ভদ্রলোককে । লালমোহনবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। উনি ষোল আনা শিওর যে বই হিট হবেই। বললেন, 'মনের ভার নেমে গিয়ে অনেকটা হাল্‌কা লাগছে মশাই।'

'তার মানে এবার থেকে কি প্রত্যেক বই বেরোবার আগেই মেচেদা—?'

'বছরে দুটি ত! সাক্সেসের গ্যারাণ্টি যেখানে পাচ্ছি. '

ভটচায মশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে আমরা বৈকুণ্ঠপুর রওনা দিলাম। নবকুমারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রোল পাম্পে জিগ্যেস করে নিয়োগী প্যালেসে পৌঁছাতে লাগল বিশ মিনিট।

বাড়ির বয়স যে দুশো সেটা আর বলে দিতে হয় না। খানিকটা অংশ মেরামত করে রং করা হয়েছে সম্প্রতি, বাড়ির লোকজন বোধহয় সেই অংশটাতেই থাকে। দুদিকে পামগাছের সারিওয়ালা রাস্তা পেরিয়ে বিরাট পোর্টিকোর নিচে এসে আমাদের গাড়ি থামল। নবকুমারবাবু গাড়ির আওয়াজ পেয়েই নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একগাল হেসে আসুন আসুন বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমরা কথা রাখব কিনা এ বিষয়ে তাঁর খানিকটা সংশয় ছিল এটাও বললেন।

'বাবাকে আপনার কথা বলেছি,' সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক। 'আপনারা আসছেন শুনে উনি খুব খুশি হলেন।'

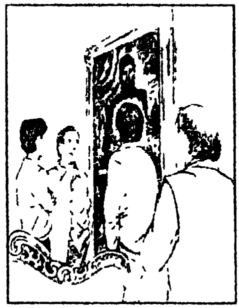
'আর কে থাকেন এ বাড়িতে?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'সব সময় থাকার মধ্যে বাবা আর মা। মা-র জন্যেই থাকা। ওর শ্বাসের কষ্ট। কলকাতার ক্লাইমেট সহ্য হয় না। তাছাড়া বঙ্কিমবাবু আছেন। বাবার সেক্রেটারি ছিলেন। এখন ম্যানেজার বলতে পারেন। আর চাকর বাকর। আমি মাঝে মধ্যে আসি। এমনিতেও আমি ফ্যামিলি নিয়ে আর ক'দিন পরেই আসতাম। এ বাড়িতে পুজো হয়, তাই প্রতিবারই আসি। এবারে একটু আগে এলাম কারণ শুনলাম বাড়িতে অতিথি আছে—আমার কাকা, চন্দ্রশেখরের

ছেলে, রোম থেকে এসেছেন কদিন হল—তাই মনে হল বাবা হয়ত একা ম্যানেজ করতে পারছেন না।'

'আপনার কাকার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে বুঝি?'

'একেবারেই না। এই প্রথম এলেন। বোধহয় দাদুর সম্পত্তির ব্যাপারে।'



'আপনার দাদু কি মারা গেছেন?'

'খবরাখবর নেই বহুদিন। বোধহয় মৃত বলেই ধরে নিতে হবে।' 'উনি রোম থেকে ফিরে এসে এখানেই থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় না থেকে এখানে কেন?'

'কারণ উনি যাদের ছবি আঁকতেন তারা সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। নেটিভ স্টেটের রাজা-মহারাজা। কাজেই ওঁর পক্ষে কলকাতায় থাকার কোনো বিশেষ সুবিধে ছিল না।'

'আপনি আপনার দাদুকে দেখেছেন?'

'উনি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন আমার বয়স ছয়। আমায় ভালবাসতেন খুব এইটুকু মনে আছে।'

বৈঠকখানায় আসবাবের চেহারা দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। মাথার উপরে ঘরের দুদিকে দুটো ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে যেমন আর আমি কখনো দেখিনি। একদিকের দেয়ালে প্রায় আসল মানুষের মতো বড় একটা পোর্ট্রেট রয়েছে একজন বৃদ্ধের—গায়ে জোব্বা, কোমরে তলোয়ার, মাথায় মণিমুক্তো বসানো পাগড়ি। নবকুমার বললেন ওটা ওঁর প্রপিতামহ অনন্তনাথ নিয়োগীর ছবি। চন্দ্রশেখর ইটালি থেকে ফিরে এসেই ছবিটা এঁকেছিলেন।—'ছেলে ইটালিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছে শুনে অনন্তনাথ বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন আর কোনদিন ছেলের মুখ দেখবেন না। কিন্তু শেষ বয়সে ওঁর মনটা অনেক নরম হয়ে যায়। দাদু বিপত্নীক অবস্থায় ফিরলে উনি দাদুকে ক্ষমা করেন এবং উনিই দাদুর প্রথম সিটার।'

আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'এস নিয়োগী লেখা দেখছি কেন? ওঁর নাম ত ছিল চন্দ্রশেখর।'

'রোমে গিয়ে ওঁর নাম হয় সান্দ্রো। সেই থেকে ওই নামই লিখতেন নিজের ছবিতে।'

পোর্ট্রেট ছাড়া ঘরে আরো ছবি ছিল এস নিয়োগীর আঁকা। আর্টের বইয়ে যে সব বিখ্যাত বিলিতি পেন্টারের ছবি দেখা যায়, তার সঙ্গে প্রায় কোনো তফাত নেই। বোঝাই যায় দুর্দান্ত শিল্পী ছিলেন সান্দ্রো নিয়োগী।

একজন চাকর সরবৎ নিয়ে এল। ট্রে থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'ওই প্রবন্ধটাতে ভদ্রলোক লিখেছেন চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে নাকি কোনো বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীর আঁকা একটি পেণ্টিং ছিল। অবিশ্যি ভদ্রলোক শিল্পীর নাম বলেননি, কারণ চন্দ্রশেখরই নাকি ওঁকে বলতে বারণ করেছিলেন—বলেছিলেন "বললে কেউ বিশ্বাস করবে না"। আপনি কিছু জানেন এই পেন্টিং সম্বন্ধে?'

নবকুমারবাবু বললেন, 'দেখুন, মিস্টার মিত্র—পেন্টিং একটা আছে এটা আমাদের পরিবারের সকলেই জানে। বেশি বড় না। এক হাত বাই দেড় হাত হবে। একটা ক্রাইস্টের ছবি। সেটা কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কিনা বলতে পারব না। ছবিটা দাদু নিজের স্টুডিওর দেয়ালেই টাঙিয়ে রাখতেন, অন্য কোনো ঘরে টাঙানো দেখিনি কখনো।'

'অবিশ্যি যিনি প্রবন্ধটা লিখেছেন তিনি জানেন নিশ্চয়ই।'

'তাত জানবেনই, কারণ ভগওয়ানগড়ের এই রাজার সঙ্গে দাদুর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।'

'আপনার কাকা জানতেন না? যিনি এসেছেন?'

নবকুমার মাথা নাড়লেন।

'আমার বিশ্বাস বাপ আর ছেলের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তাছাড়া কাকা বোধহয় আর্টের দিকে যাননি।'

'তার মানে ওই ছবির সঠিক মূল্যায়ন এ বাড়ির কেউ করতে পারবে না?'

'কাকা না পারলে আর কে পারবে বলুন। বাবা ছিলেন গানবাজনার লোক। রাতদিন ওই নিয়েই পড়ে থাকতেন। আর্টের ব্যাপারে 'আমার যা জ্ঞান, ওঁরও সেই জ্ঞান। আর আমার ছোটভাই নন্দকুমার সম্বন্ধেও ওই একই কথা।'

'তিনিও গান বাজনা নিয়ে থাকেন বুঝি?'

'না। ওর হল অ্যাকটিং-এর নেশা। আমাদের একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে কলকাতায়। বাবাই করেছিলেন, আমরা দুজনেই পার্টনার ছিলাম তাতে। নন্দ সেভেন্টি-ফাইভে হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে বম্বে চলে যায়। ওর কে চেনা লোক ছিল ওখানকার ফিল্ম লাইনে। তাকে ধরে হিন্দি ছবিতে একটা অভিনয়ের সুযোগ করে নেয়। তারপর থেকে ওখানেই আছে।'

'সাকসেসফুল?'

'মনে ত হয় না। ফিল্ম পত্রিকায় গোড়ার দিকের পরে ত আর বিশেষ ছবিটবি দেখিনি ওর।'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'মোটেই না। শুধু জানি নেপিয়ান সী রোডে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়ির নাম বোধহয় সী-ভিউ। মাঝে মাঝে ওর নামে চিঠি আসে। সেগুলো রিডাইরেক্ট করতে হয়। ব্যস্।' সরবৎ শেষ করে আমরা নবকুমারবাবুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দক্ষিণের একটা চওড়া বারান্দায় একটা ইংরিজি পেপারব্যাক চোখের খুব কাছে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে আছেন ভদ্রলোক।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভদ্রলোক ছেলেকে বললেন, 'ঠুমরীর কথা বলেছিস এঁকে?'

নবকুমারবাবু একটু অপ্রস্তুত ভাব করে বললেন, 'তা-বলেছি। তবে ইনি এমনি বেড়াতে এসেছেন, বাবা।'

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'কুকুর বলে তোরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছিস না, এটা আমার মোটে ভালো লাগছে না। একটা অবলা জীবকে যে-লোক এভাবে হত্যা করে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত নয়? শুধু কুকুরকে মেরেছে তা নয়, আমার চাকরকে শাসিয়েছে। তাকে মোটা ঘুষ দিয়েছে, নইলে সে পালাত না। ব্যাপারটায় অনেক গণ্ডগোল। আমার ত মনে হয় যে-কোনো ডিটেকটিভের পক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপাব। মিস্টার মিত্তির কী মনে করেন জানি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল ফেলুদা।

'যাক্। আমি শুনে খুশি হলুম। এবং সে লোককে যদি ধরতে পারেন ত আরো খুশি হব। ভালো কথা—' সৌম্যশেখরবাবু ছেলের দিকে ফিরলেন— 'তোর সঙ্গে রবীনবাবুর দেখা হয়েছে?'

'রবীনবাবু?' নবকুমারবাবু বেশ অবাক। 'তিনি আবার কে?'

'একটা জার্নালিস্ট ভদ্রলোক। বয়স বেশি না। আমায় লিখেছিল আসবে বলে। চন্দ্রশেখরের জীবনী লিখবে। একটা ফেলোশিপ না গ্রান্ট কী জানি পেয়েছে। সে দুদিন হল এসে রয়েছে। অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। ইটালিও যাবে বলে বলছে। বেশ চৌকস ছেলে। আমার সঙ্গে কথা বলে সকালে ঘন্টাখানেক ধরে টেপ করে নেয়।'

'তিনি কোথায় এখন?'

'বোধহয় তার ঘরেই আছে। এক তলায় উত্তরের বেডরুমটায় রয়েছে। আরো দিন দশেক থাকবে। রাতনদি কাজ করে।'

'তার মানে তোমাকে দুজন অতিথি সামলাতে হচ্ছে?'

'সামলানোর আর কী আছে। রোম থেকে আসা খুড়তুতো ভাইটিকে ত সারাদিনে প্রায় চোখেই দেখিনা। আর যখন দেখিও, দু'চারটের বেশি কথা হয় না। এমন মুখচোরা লোক দুটি দেখিনি।'

'যখন কথা বলেন কী ভাষায় বলেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ইংরিজি বাংলা মেশানো। বললে চন্দ্রশেখর নাকি ওর সঙ্গে বাংলাই বলত। তবে সেও ত আজ প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর যখন দেশে ফেরে তখন ছেলের বয়স আঠারো-উনিশ। বাপের সঙ্গে বোধহয় বিশেষ বনত না। পাছে কিছু জিগ্যেস-টিগ্যেস করি তাই বোধহয় কথা বলাটা অ্যাভয়েড করে। ভেবে দেখুন—আমার নিজের খুড়তুতো ভাই, তাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে বোঝাতে হল সে কে।'

'ইণ্ডিয়ান পাস্‌পোর্ট কি? ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'তাইত দেখলাম।'

নবকুমারবাবু বললেন, 'তুমি ভালো করে দেখেছিলে ত?'

'ভালো করে দেখার দরকার হয় না। সে যে নিয়োগী পরিবারেব ছেলে সে আর বলে দিতে হয় না।'

'উনি সম্পত্তির ব্যাপারেই এসেছেন ত?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'হ্যাঁ এবং পেযেও যাবে। সে নিজে তার বাবার কোনো খবরই জানত না। তাই রোম থেকে চিঠি লিখেছিল আমায়। আমিই তাকে জানাই যে দশ বছর হল তার বাপের কোনো খোঁজ নেই। তাব পরেই সে এসে উপস্থিত হয়।'

ফেলুদা বলল, 'চন্দ্রশেখরের সংগ্রহে যে বিখ্যাত পেণ্টিংটা আছে সেটা সম্বন্ধে উনি কিছু জানেন? কিছু বলেছেন?'

'না। ইনি নাকি ইঞ্জিনিযারিং-এর লোক। আর্টে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ....তবে ছবিটার খোঁজ করতে লোক এসেছিল।'

'কে?' জিগ্যেস করলেন নবকুমারবাবু।

'সোমানি না কী যেন নাম। বঙ্কিমের কাছে তাব নাম ঠিকানা আছে। বললে এক সাহেব কালেকটর নাকি ইনটারেস্টেড। এক লাখ টাকা অফার করলে। প্রথমে পঁচিশ হাজার দেবে, তাবপর সাহেব দেখে জেনুইন বললে বাকি টাকা। দিন পনের আগেব ঘটনা। তখনও রুদ্রশেখর আসেনি, তবে আসবে বলে লিখেছে। সোমানিকে বললাম এ হল আর্টিস্টের ছেলের প্রপার্টি। সে ছেলে আসছে। যদি বিক্রী করে ত সেই করবে। আমার কোনো অধিকাব নেই।'

'সে লোক কি আর এসেছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'এসেছিল বৈকি। সে নাছোড়বান্দা। এবার রুদ্রশেখরের সঙ্গে কথা বলেছে'

'কী কথা হয়েছিল জানেন?'

'না। আর রুদ্র যদি বিক্রিও করতে চায়, আমাদের ত কিছু বলার নেই। তার নিজের ছবি সে যা ইচ্ছে করতে পারে।'

'কিন্তু সেটা সম্পত্তি পাবার আগে ত নয়', বলল ফেলুদা।

'না তাতো নয়ই।'

খাবার সময় দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা হল। রবীনবাবু সাংবাদিককে দেখে হঠাৎ কেন জানি চেনা-চেনা মনে হয়েছিল; হয়তো কোনো কাগজে ছবি-টবি বেরিয়েছে কখনো। দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাঝারি রং, চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি না। বললেন অদ্ভুত সব তথ্য বার করেছেন চন্দ্রশেখর নিয়োগী সম্বন্ধে। স্টুডিয়োতে একটা কাঠের বাক্সে নাকি অনেক মূল্যবান কাগজপত্র আছে।

'রুদ্রশেখরবাবু থাকাতে আপনার খুব সুবিধে হয়েছে বোধহয়?' বলল ফেলুদা, 'ইটালির অনেক খবর ত আপনি এঁর কাছেই পাবেন।'

'ওঁকে আমি এখনো বিরক্ত করিনি,' বললেন রবীনবাবু, 'উনি নিজে ব্যস্ত রয়েছেন। আপাতত আমি চন্দ্রশেখরের ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরের অংশটা নিয়ে রিসার্চ করছি।'

রুদ্রশেখরের মুখ দিয়ে একটা হুঁ ছাড়া কোনো শব্দ বেরোল না।

বিকেলে নবকুমারবাবুর সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কাছেই পোড়া ইটের কাজ করা দুটো প্রাচীন মন্দির আছে সেগুলো নাকি খুবই সুন্দর। ফটক দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় পড়তেই একটা কাণ্ড হল। পশ্চিম দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই বজ্রপাতের সঙ্গে নামল তুমুল বৃষ্টি। লালমোহনবাবু বললেন এরকম ড্রামাটিক বৃষ্টি তিনি কখনো দেখেননি। সেটার একটা কারণ অবশ্য এই যে এ রকম খোলা প্রান্তরে বৃষ্টি দেখার সুযোগ শহরবাসীদের হয় না।

দৌড় দেওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির ফোঁটা এড়ান গেল না। তারপর বুঝতে পারলাম যে এ বৃষ্টি সহজে ধরার নয়। আর আমাদের পক্ষে এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরাও সম্ভব নয়।

নবকুমারবাবু অবিশ্যি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন বাড়তি শোবার ঘর কম করে দশখানা আছে এ বাড়িতে। খাট বালিশ তোষক চাদর মশারি সবই আছে; কাজেই রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থা করতে কোনোই হ্যাঙ্গম নেই। পরার জন্য লুঙ্গী দিয়ে দেবেন উনি, এমন কি গায়ের আলোয়ান, ধোপে কাচা পাঞ্জাবী, সবই আছে।—'আমাকে এখানে মাঝে মাঝে আসতে হয় বলে কয়েক সেট কাপড় রাখাই থাকে। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না।'

উত্তরের দিকে পাশাপাশি দুটো পেল্লায় ঘরে আমাদের বন্দোবস্ত হল। লালমোহনবাবু একা একটি জাঁদরেল খাট পেয়েছেন, বললেন, 'একদিন-কা সুলতানের গপ্পের কথা মনে পড়ছে মশাই'।

তা খুব ভুল বলেননি। দুপুরে শ্বেত পাথরের থালাবাটি গেলাসে খাবার সময় আমারও সে কথা মনে হয়েছিল। রাত্তিরে দেখি সেই সব জিনিসই রূপোর হয়ে গেছে।

'আপনার দাদুর স্টুডিওটা কিন্তু দেখা হল না,' খেতে খেতে বলল ফেলুদা।

'সেটা কাল সকালে দেখাব', বললেন নবকুমারবাবু। 'আপনারা যে দুটো ঘরে শুচ্ছেন, ওটা ঠিক তারই উপরে।'

যখন শোবার বন্দোবস্ত করছি, তখন বৃষ্টিটা ধরে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাজবাড়ির পিছনে বাগান, সামনে মাঠ। আমাদের ঘর থেকে বাগানটাই দেখা যাচ্ছে, তার গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছে। অন্য কোনো বাড়ির শব্দ এখানে পৌঁছায় না, যদিও পূবে বাজারেব দিক থেকে ট্রানজিস্টারের গানের একটা ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি।



সাড়ে দশটা নাগাদ লালমোহনবাবু গুডনাইট করে তার নিজের ঘরে চলে গেলেন। দুই ঘরেব মাঝখানে একটা দরজা আছে। ভদ্রলোক বললেন সেটা বেশ কনভিনিয়েন্ট।

এই দরজা দিয়েই ভদ্রলোক মাঝরাত্তিরে ঢুকে এসে চাপা গলায় ডাক দিয়ে ফেলুদাব ঘুম ভাঙালেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'কী ব্যাপার মশাই ? এত রাত্তিরে ?'

'শ্ শ্ শ্ শ্! কান পেতে শুনুন'?

কান পাতলাম। আর শুনলাম।

খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ ....

মাথার উপর থেকে শব্দটা আসছে। একবার একটা খুট শব্দও পেলাম। কেউ হাঁটা চলা করছে।

মিনিট তিনেক পরে শব্দ থেমে গেল।

উপরেই সান্‌ড্রো নিয়োগীব স্টুডিও।

ফেলুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তোরা থাক্, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

ফেলুদা খালি পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু আর আমি আমাদের খাটে বসে রইলাম। প্রচণ্ড সাসপেন্স,

ফেলুদা না-আসা পর্যন্ত হৃৎপিন্ডটা ঠিক আলজিভের পিছনে আটকে রইল। প্রাসাদের কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। তারপর আরো দুটো ঘড়িতে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ঠিক তেমনি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল ফেলুদা।

'দেখলেন কাউকে?' চাপা গলায় ঘড়ঘড়ে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন।

'ইয়েস।'

'কাকে।'

'সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমে গেল।'

'কে?'

'সাংবাদিক রবীন চৌধুরী।'

৪

রাত্তিরের ঘটনাটা আর নবকুমারবাবুকে বলল না ফেলুদা। চায়ের টেবিলে শুধু জিগ্যেস করল, 'স্টুডিওটা চাবি দেওয়া থাকে না?'

'এমনিতে সবসময়ই থাকে', বললেন নবকুমাববাবু, 'তবে ইদানীং রবীনবাবু প্রায়ই গিয়ে কাজ করেন। রুদ্রশেখরবাবুও যান, তাই ওটা খোলাই থাকে।' চাবি থাকে বাবার কাছে।

চা খাওয়ার পর আমরা চন্দ্রশেখরের স্টুডিওটা দেখতে গেলাম।

তিনতলায় ছাত। তারই একপাশে উত্তর দিকটায় স্টুডিও। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ঘুরে স্টুডিওতে ঢোকার দরজা।

উত্তরের আলো নাকি ছবি আঁকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো, তাই স্টুডিওর উত্তরের দেয়ালটা পুরোটাই কাঁচ। বেশ বড় ঘরের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে ডাঁই করা ছবি, নানান সাইজের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা ক্যানভাস, দুটো বেশ বড় টেবিলের উপর রং তুলি প্যালেট ইত্যাদি নানারকম ছবি আঁকার সরঞ্জাম, জানালার পাশে দাঁড় করানো একটা ইজেল। সব দেখেটেখে মনে হয় আর্টিস্ট যেন কিছুক্ষণের জন্য সটুডিও ছেড়ে বেরিয়েছেন, আবার এক্ষুনি ফিরে এসে কাজ শুরু করবেন।

'জিনিসপত্তর সবই বিলিতি', চারিদিক দেখে ফেলুদা মন্তব্য করল। 'এমন কি লিনসীড অয়েলের শিশিটা পর্যন্ত। রংগুলো ত দেখে মনে হয় এখনো ব্যবহার করা চলে।'

ফেলুদা দু'একটা টিউব তুলে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল।

'হুঁ, ভালো কন্ডিশনে রয়েছে জিনিসগুলো। রুদ্রশেখর এগুলো বিক্রী করেও ভালো টাকা পেতে পারেন। আজকালকার যে কোনো আর্টিস্ট এসব জিনিস পেলে লুফে নেবে।'

ঘরের দক্ষিণ দিকের বড় দেয়ালে আট-দশটা ছবি টাঙানো রয়েছে। তার একটার দিকে নবকুমারবাবু আঙুল দেখালেন।

'ওটা দাদুর নিজের আঁকা নিজের ছবি।'

আর্টিস্টরা অনেক সময় আয়নার সামনে বসে সেলফপোর্ট্রেট আঁকতেন সেটা আমি জানি। চন্দ্রশেখর নিজেকে এঁকেছেন বিলিতি পোষাকে। চমৎকার শার্প, সুপুরুষ চেহারা। কাঁধ অবধি ঢেউখেলানো কুচকুচে কালো চুল, দাঁড়ি আর গোঁফও খুব হিসেব করে আঁচড়ানো বলে মনে হয়।

'এই ছবিটাই ওই প্রবন্ধের সঙ্গে বেরিয়েছে', বলল ফেলুদা।

'তা হবে', বললেন নবকুমারবাবু, 'বাবার কাছে শুনেছিলাম ভূদেব সিং-এর এক ছেলে এখানে এসেছিল একদিনের জন্য। বাপের আর্টিকেলের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে যায়'।

'ভদ্রলোকের রঙ ত তেমন ফর্সা ছিল বলে মনে হচ্ছে না।'

'না' বললেন নবকুমারবাবু। 'উনি আমার প্রপিতামহ অনন্তনাথের রং পেয়েছিলেন। মাঝারি'।

সেই বিখ্যাত ছবিটা কোথায়?' এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

নবকুমারবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণের দেযালেব একেবাবে কোণের দিকে।

গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে যীশুখৃষ্টের ছবিটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, চোখে উদাস চাহনি. ডান হাতটা বুকের উপর আলতো করে রাখা। মাথার পিছনে একটা জ্যোতি, তারও পিছনে গাছপালা পাহাড় নদী বিদ্যুত-ভরা মেঘ মিলিয়ে একটা নাটকীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আমরা মিনিট খানেক ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ছবিটির দিকে। কিছুই জানিনা, অথচ মনে হল হাজার ঐশ্বর্য, হাজার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে।

ফেলুদার হাবভাব বেশ বুঝতে পারছিলাম যে বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগীদের সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ নয়। নিচে এসেই ফেলুদা একটা অনুরোধ করল নবকুমারবাবুকে।

'আপনাদের একটা বংশলতিকা পাওয়া যাবে কি? অনন্তনাথ থেকে শুরু করে আপনারা পর্যন্ত। জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির তারিখ সমেত হলে ভালো হয়,

আর আলাদা করে চন্দ্রশেখরের জীবনের জরুরী তারিখগুলো। অবিশ্যি যেসব তারিখ আপনাদের জানা আছে।

'আমি বঙ্কিমবাবুকে বলছি। উনি খুব এফিশিয়েন্ট লোক। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী করে দেবেন আপনাকে।'

'আর, ইয়ে—যে ভদ্রলোক ছবি কিনতে এসেছিলেন তাঁর ঠিকানাটা। যদি বঙ্কিমবাবুর কাছে থাকে।'

বঙ্কিমবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ চালাক চেহারা। হাসলেই গোঁফের নিচে ধব্‌ধবে সাদা দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। বললেন বংশলতিকা একটা রবীনবাবুর জন্য করেছিলেন, তাঁর কার্বন রয়েছে। সেটা পেতে দশ মিনিটের জায়গায় লাগল দু মিনিট।



যিনি ছবি কিনতে এসেছিলেন তার একটা কার্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে ছিল, উনি সেটা এনে দিলেন ফেলুদাকে। দেখলাম নাম হচ্ছে হীরালাল সোমানি, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২৩, লোটাস টাওয়ারস, আমীর আলি অ্যাভিনিউ।

কার্ডটা দেবার পর ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়ে মুখে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব। ফেলুদা বলল, 'কিছু বলবেন কি?'

'আপনার নাম শুনেছি', বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি ডিটেকটিভ ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি আবার আসবেন?'

'প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আসব। কেন বলুন ত?'

'ঠিক আছে', ভদ্রলোকের এখনো সেই ইতস্তত ভাব, 'মানে, একটু ইয়ে ছিল। তা সে পরেই হবে।'

আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হল, যদিও পরে ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'বোধহয় অটোগ্রাফ নেবার ইচ্ছে ছিল, বলতে সাহস পেলেন না।'

গাড়িতে যখন উঠছি তখন ফেলুদা নবকুমারকে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ মিষ্টার নিয়োগী। আপনাদের এখানে এসে সত্যিই ভালো লাগল। যা দেখলাম আর শুনলাম তা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি যদি একটু এদিক ওদিক খোঁজখবর করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না ত?'

'মোটেই না।'

'একবার ভগওয়ানগড়ে ভূদেব সিং-এর কাছে যাবার ইচ্ছে আছে। ওই

যীশুর বাজার দরটা কী হতে পারে সেটা একবার ওঁর কাছ থেকে জানা দরকার।'

'বেশ ত, চলে যান ভগওয়ানগড়। আমার আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'আর আপনার বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছেন; আপনাদের ফক্স-টেরিয়ার খুনের ব্যাপারটাকে কিন্তু আপনি মোটেই হালকা করে দেখবেন না। আমি ওটার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'

'তাতো বটেই। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত নৃশংস বলে মনে হয়েছিল।'

ফেলুদা আর নবকুমারবাবুর মধ্যে কার্ড বিনিময় হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন, তেমন বুঝলে সোজা চলে আসবেন। আর ভগওয়ানগড়ে কী হল সেটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন।'

'ভগওয়ানগড় বলে যে একটা জায়গা আছে সেটাই জানা ছিল না মশাই,' ফেরার পথে বললেন লালমোহনবাবু।

'জায়গাটা বোধহয় মধ্যপ্রদেশে', বলল ফেলুদা। 'তবে আই অ্যাম নট শিওর। গিয়েই পুষ্পক ট্র্যাভেলসের সুদর্শন চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হতে হবে।'

'এম পি-টা দেখা হয়নি,' আপন মনে বললেন জটায়ু।

'অবিশ্যি এ যাত্রায় যে বিশেষ দেখা হবে সেটা মনে করবেন না। স্রেফ কতগুলো তথ্য জেনে নিয়ে ফিরে আসা। বৈকুণ্ঠপুরকে বেশিদিন নেগলেক্ট করা চলবে না।'

'এটা কেন বলছেন?'

'রুদ্রশেখরের পায়ের দিকে লক্ষ করেছেন?'

'কই, না ত।'

'রবীন চৌধুরীর খাওয়াটা লক্ষ করেছেন?'

'কই না ত।'

'তাছাড়া ভদ্রলোক রাত দুটোর সময় স্টুডিওতে কী করেন, বঙ্কিমবাবু কী বলতে গিয়ে বললেন না, একটা কুকুরকে কী কী কারণে খুন করা যেতে পারে—এসব অনেক প্রশ্ন আছে।'

আমি বললাম, 'কোনো বাড়ির কুকুর যদি ভালো ওয়াচডগ হয়, তাহলে একজন চোর সে-বাড়ি থেকে কিছু সরাবার মতলব করে থাকলে আগে কুকুরকে সরাতে পারে।'

'ভেরি গুড। কিন্তু কুকুরকে মারা হয়েছে মঙ্গলবার আঠাশে সেপ্টেম্বর, আর আজ হল ৫ই অক্টোবর। কই, এখনো ত কিছু চুরি হয়েছে বলে জানা

যায়নি। আর, এগারো বছরের বুড়ো ফক্স- টেরিয়ার কতই বা ভালো ওয়াচডগ হবে?'

'আমার কী আপশোস হচ্ছে জানেন ত?' বললেন লালমোহনবাবু।

'কী?'

'যে আর্টের বিষয় এতো কম জানি।'

'বর্তমান ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে একজন প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি যদি বাজারে আসে, তাহলে তার দাম লাখ দু' লাখ টাকা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'অ্যাঁ'!

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে বলতে চান একটি লাখ টাকার ছবি চল্লিশ বছর ধরে টাঙানো রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের ওই স্টুডিওর দেয়ালে, অথচ সেটা সম্বন্ধে কেউ কিচ্ছু জানেনা?'

'ঠিক তাই। এবং সেইটে জানার-জন্যেই ভগওয়ানগড় যাওয়া।'

৫

কলকাতায় ফিরে এসেই প্রবন্ধের কথাটা উল্লেখ করে একটা জরুরী অ্যাপয়েণ্টমেন্ট চেয়ে টেলিগ্রাম করে দিল ভগওয়ানগড়ের এক্স মহারাজা ভূদেব সিংকে। তার আগেই অবিশ্যি পুষ্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করেছিল ফেলুদা। ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল; ভগওয়ানগড় মধ্যপ্রদেশেই, তবে আমাদের প্রথমে যেতে হবে নাগপুর। সেখান থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে ছিন্দওয়ারা। ছিন্দওয়ারা থেকে সাতাত্তর কিলোমিটার পশ্চিমে হল ভগওয়ানগড়।

টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল পরের দিনই। এই সপ্তাহে যে-কোনোদিন গেলেই ভূদেব সিং আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কবে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে ছিন্দওয়ারাতে রাজার লোক গাড়ি নিয়ে থাকবে।

সুদর্শনবাবুকে ফোন করতে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের তাড়া থাকলে কাল বুধবার ভোরে, একটা নাগপুর ফ্লাইট আছে। সাড়ে ছ'টায় রওনা হয়ে পৌঁছবেন সোয়া আটটায়। তারপর নাগপুর থেকে সাড়ে দশটায় ট্রেন আছে, সেটা ছিন্দওয়ারা পৌঁছবে বিকেল পাঁচটায়। ট্রেনের টিকিট আপনাদের ওখানেই কেটে নিতে হবে।'

'আর ফেরার ব্যাপারটা?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'আপনি বিষ্যুদবার রাত্রে আবার ছিন্দওয়ারা থেকে ট্রেন ধরতে পারবেন। সেটা নাগপুর পৌঁছবে শুক্রবার ভোর পাঁচটায়। সেদিনই কলকাতার ফ্লাইট আছে তিনঘন্টা পরে। সাড়ে দশটায় ব্যাক্ ইন ক্যালকাটা।'

সেইভাবেই যাওয়া ঠিক হল, আর রাজাকেও জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল।

আজকের বাকি দিনটা হাতে আছে, তাই ফেলুদা ঠিক করল এই ফাঁকে একটা জরুরী কাজ সেরে নেবে।

টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলাম আমীর অলি অ্যাভিনিউতে লোটাস টাওয়ারসে হীরালাল সোমানির ফ্ল্যাটে।



বেল টিপতে একটি বেয়ারা এসে দরজা খুলে আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের সংগ্রহের বাতিক আছে, আর অনেক জিনিসেরই যে অনেক দাম সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। যেটা নেই সেটা হল সাজানোয় পারিপাট্য।

ঝাড়া দশ মিনিট বসিয়ে রাখার পর সোমানি সাহেব প্রবেশ করলেন, আর করামাত্র একটা পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি সবেমাত্র গোসল সেরে এলেন। সাদা ট্রাউজারের উপর সাদা কুর্তা। পায়ে সাদা কোলাপুরি চটি। পালিশ করে আঁচড়ানো চুলেও সাদার ছোপ লক্ষ করা যায়। যদিও সরু করে ছাঁটা গোঁফটা সম্পূর্ণ কালো।

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় বসে ফেলুদা ও লালমোহনবাবুকে সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন—

'বলুন কী ব্যাপার।'

'আমি কয়েকটা ইনফ্রমেশন চাইছিলাম', বলল ফেলুদা।

'বলুন, যদি পসিব্‌ল হয় দেবো।'

'আপনি রিসেন্টলি একটা ছবির খোঁজে বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলেন। তাই না?'

'ইয়েস।'

'ওরা বিক্রী করতে র‍্যাজি হননি।'

'নো।'

'আপনি ছবির কথাটা কীভাবে জানলেন সেটা জানতে পারি কি?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, যেন ফেলুদা বাড়াবাড়ি করছে, এবং উত্তর দেওয়া-না দেওয়াটা তাঁর মর্জি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরটা এল।

'আমি জানিনা। আরেকজন জেনেছিলেন। আমি তাঁরই রিকোয়েস্টে ছবি কিনতে গিয়েছিলাম।'

'আই সী।'

'আপনি কি সেই ছবি আমায় এনে দিতে পারেন? তবে, জেনুইন জিনিস চাই। ফোর্জারি হলে এক পইসা ভি নহী মিলেগা।'

'জাল না আসল সেটা আপনি বুঝবেন কি করে?'

'আমি বুঝব কেন? যিনি কিনবেন তিনি বুঝবেন। হি হ্যাজ থার্টি-ফাইভ ইয়ারস এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ বাইয়ার অফ পেণ্টিংস।'

'তিনি কি এদেশের লোক?'

সোমানি সাহেবের চোয়ালটা যেন একটু শক্ত হল। ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি ফেলুদার দিক থেকে। এই প্রথম ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোনে একটা হাসির আভাস দেখা গেল।

'এ-ইনফরমেশন আমি আপনাকে দেব কেন? আমি কি বুদ্ধু?'

'ঠিক আছে।'

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরী হচ্ছিল, এমন সময় সোমানি বললেন, 'আপনি যদি ছবি আমাকে এনে দিতে পারেন, আমি আপনাকে কমিশন দেব।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'টেন থাউজ্যাণ্ড ক্যাশ।'

'আর তারপর সেটা দশ লাখে বিক্রী করবেন?'

সোমানি কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ফেলুদার দিকে।

'ছবি পেলে আপনাকে দেবো কেন, মিস্টার সোমানি?' বলল ফেলুদা। 'আমি সোজা চলে যাব আসল লোকের কাছে।'

'নিশ্চয় যাবেন, বাট ওনলি ইফ ইউ নো হোয়্যার টু গো।'

'সে সব বার করার রাস্তা আছে, মিস্টার সোমানি। সকলের না থাকলেও, আমার আছে। ....আমি আসি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'অনেক ধন্যবাদ।'

'গুডডে, মিস্টার প্রদোষ মিত্র।'

শেষ কথাটা ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন উনি ফেলুদার নাম ও পেশা দুটোর সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত।

'একরকম মাংসাশী ফুল আছে না,' বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন লালমোহনবাবু, 'দেখতে খুব বাহারে, অথচ পোকা পেলেই কপ্‌ করে গিলে ফেলে?'

'আছে বৈকি।'

'এ লোক যেন ঠিক সেইরকম।'

ফেলুদার উৎকণ্ঠার ভাবটা বুঝতে পারলাম যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসেই ও বৈকুণ্ঠপুরে একটা ফোন করল।

তবে নবকুমারবাবু বললেন আর নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি।

বাড়িতে ফিরে বৈঠকখানায় বসে 'ভাই, শ্রীনাথকে একটু চা করতে বলো না,' বলে লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা বই বার কবে সশব্দে টেবিলের উপব রাখলেন। বইটা হল 'সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস', লেখক অনুপম ঘোষ দস্তিদার।

'কী বলছেন ঘোষদস্তিদার মশাই?' আড়চোখে বইটা দেখে প্রশ্ন করল ফেলুদা। ও নিজে আজই দুপুরে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে দুটো মোটা আর্টের বই নিয়ে এসেছে সেটা আমি জানি।

'ওঃ, ভেরি ইউজফুল মশাই। আপনি আব রাজা কথা বলবেন আর্ট নিয়ে, আর আমি হংসমধ্যে বক যথা, এ হতে দেওয়া যায় না। এটা পড়ে নিলে আমিও পার্টিসিপেট করতে পারব।'

'গোটা বইটা পড়ার কোনো দরকার নেই; আপনি শুধু রেনেসাঁস অংশটা পড়ে রাখবেন। রেনেসাঁস আছে ত ও বইয়ে?'

'দাঁড়ান, দেখে নিই। ...কী বললেন? রেনেসাঁস?'

'হ্যাঁ।'

'তা তো বলছে না।'

'তবে কী বলছে?'

'রিনেইস্যান্স।'

'ঘোষদস্তিদারের জবাব নেই।'

'জিনিসটা ত একই?'

'তা একই।'

'ইয়ে, রেনেসাঁস বলতে বোঝাচ্ছেটা কী?'

'পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দী। এই দেড়শো-দুশো বছর হল ইটালির পুনর্জন্মের যুগ। রেনেসাঁস হল পুনর্জন্ম, পুনর্জাগরণ।'

'কেন, পুনঃ বলছে কেন? হোয়াই এগেইন?'

'কারণ প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যান সভ্যতার আদর্শে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল এই যুগে—যে আদর্শ মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই রেনেসাঁস। ইটালিতে শুরু হলেও রেনেসাঁসের প্রভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ইউরোপে। বহু প্রতিভা জন্মেছে এই সময়টাতে। শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে। ছাপাখানার উদ্ভব এই সময়; তার মানে শিক্ষার প্রসার এই সময়। কোপনির্কাস, গ্যালিলিও, শেক্সপীয়র দাভিঞ্চি, রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো—সব এই দেড়শো-দুশো বছরের মধ্যে।'

'তা আপনার কি ধারণা বৈকুণ্ঠপুরের যীশুও আঁকা হয়েছে এই রেনেসাঁসের যুগে?

'তার কাছাকাছি ত বটেই। আগে নয় নিশ্চয়ই, বরং সামান্য পরে হতে পারে। মধ্যযুগের পেন্টিং-এ মানুষ জন্তু গাছপালা সব কিছুর মধ্যে একটা কেঠো-কেঠো, আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক ভাব দেখতে পাবেন। রেনেসাঁসে সেটা আরো অনেক জীবন্ত, স্বাভাবিক হয়ে আসে।'

'এই যে সব নাম দেখছি এ বইয়ে—গায়োট্রো—'

'গায়োট্রো লিখেছে নাকি?'

'তাই ত দেখছি। গায়োট্রো, বট্রিসেল্লি, মানটেগ্না'....

'আপনি ও বইটা রাখুন। আমি আর্টিস্টের নামের একটা তালিকা করে দেব—আপনি চান ত সে নামগুলো মুখস্ত করে রাখবেন। গায়োট্রো নয়। ইংরিজি উচ্চারণে জিয়োটো ইতালিয়ানে জ্যোত্তো। জ্যোত্তো, বত্তিচেল্লী, মানতেন্যা...'

'এরা সব বলছেন জাঁদরেল আঁকিয়ে ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই! শুধু এরা কেন? এ রকম অন্তত ত্রিশটা নাম পাবেন শুধু ইটালিতেই।'

'আর এই ত্রিশ জনের মধ্যে একজনের আঁকা ছবি রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরে? বোঝো!'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলুদা নিয়োগীদের বংশতালিকা খাটে বিছিয়ে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে অবিশ্যি চন্দ্রশেখরের জীবন সংক্রান্ত তারিখগুলোও ছিল। কে কার দাদু, কে কার কাকা, কে কার ভাই, এগুলো আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

দুটো জিনিসের চেহারা এই রকম—

১। বংশতালিকা

অনন্তনাথ (১৮৬২—১৯৪১)

সূর্যশেখর (১৮৮৮—১৯৪৮) চন্দ্রশেখর (১৮৯০—?)

সৌম্যশেখর (১৯১৩—) রুদ্রশেখর (১৯২০—)

নবকুমার (১৯৪১—) নন্দকুমার (১৯৪৪—)?

২। চন্দ্রশেখর নিয়োগী

১৮৯০—জন্ম (বৈকুণ্ঠপুর)

১৯১২—প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ

১৯১৪—রোমযাত্রা। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের ছাত্র

১৯১৭—কার্লা ক্যাসিনিকে বিবাহ

১৯২০—পুত্র রুদ্রশেখরের জন্ম

১৯৩৭—কার্লার মৃত্যু

১৯৩৮—স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৫৫—গৃহত্যাগ

৬

প্লেনে নাগপুরে সাড়ে আটটার সময় পৌঁছে, সেখান থেকে দশটা পঞ্চাশে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে ছিন্দওয়ারা পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। স্টেশনে শেভরোলে গাড়ি নিয়ে হাজির ছিলেন ভূদেব সিং-এর লোক। হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়সী এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ নাগপাল। চারজন গাড়িতে রওনা দিয়ে পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভগওয়ানগড়ের রাজবাড়ি।

নাগপাল বললেন, 'আপনাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে, আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, সাড়ে সাতটার সময় রাজা আপনাদের মীট করবেন। আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব।'

ঘরের চেহারা দেখেই বুঝলাম যে আজ রাতটা আমাদের এইখানেই থাকার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানা, বালিশ, লেপ, মশারি, বাথরুমে তোয়ালে সাবান—সবই রয়েছে। যে কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। লালমোহনবাবু বললেন, এখানকার বাথরুমে নাকি তাঁর গড়পারের বাড়ির পাঁচটা বেডরুম ঢুকে যায়। 'নেহাৎ টাইম নেই, নইলে টবে গরম জল ভরে শুয়ে থাকতুম আধ ঘণ্টা।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় মিঃ নাগপাল আমাদের রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। শ্বেতপাথরের মেঝেওয়ালা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন ভূদেব সিং। চেহারা যাকে বলে সৌম্যকান্তি। বয়স সাতাত্তর, কিন্তু মোটেও থুত্থুড়ে নন।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাজার সামনে তিনটে বেতের চেয়ারে বসলাম। হাসনাহানা ফুলের গন্ধে বুঝতে পারছি বারান্দার ওপরেই বাগান, কিন্তু অন্ধকারে গাছপালা বোঝা যাচ্ছে না।

কথাবার্তা ইংরিজিতেই হল, তবে আমি বেশির ভাগটা বাংলা করেই লিখছি। জটায়ু বলেছিলেন পার্টিসিপেট করবেন। কতদূর করেছিলেন সেটা যাতে ভালো বোঝা যায় তাই নাটকের মতো করে লিখছি। ভূদেব—আমার লেখাটা কেমন লাগল?

ফেলুদা—খুবই ইণ্টারেস্টিং। ওটা না পড়লে এরকম একজন শিল্পীর বিষয় কিছুই জানতে পারতাম না।

ভূদেব—আসলে আমরা নিজের দেশের লোকদের কদর করতে জানি না। বিদেশ হলে এ রকম কখনই হত না। তাই ভাবলাম—আমার ত বয়স হয়েছে, সেভেনটি-সেভেন-মরে যাবার আগে এই একটা কাজ করে যাব। চন্দ্রশেখরের বিষয় জানিয়ে দেব দেশের লোককে। আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম বৈকুণ্ঠপুর। চন্দ্রর সেল্‌ফ-পোর্ট্রেট আমার কাছে ছিল না। সে আমাকে ছবি তুলে এনে দিল।

ফেলুদা—আপনার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের আলাপ হয় কবে?

ভূদেব—দাঁড়ান, এই খাতাটায় সব লেখা আছে।....হ্যাঁ, ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সে আমার পোর্ট্রেট আঁকতে আসে এখানে। তার কথা আমি শুনি ভূপালের রাজার কাছ থেকে। রাজার পোর্ট্রেট চন্দ্র করেছিল। আমি দেখেছিলাম। আমার খুব ভালো লেগেছিল। চন্দ্র হ্যাড ওয়াণ্ডারফুল স্কিল্।

জটায়ু—ওয়াণ্ডারফুল।

ফেলুদা—আপনার লেখায় পড়েছি তিনি ইটালিতে গিয়ে একজন ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মহিলা সম্বন্ধে আরেকটু কিছু যদি বলেন।

জটায়ু—সামথিং মোর.....

ভূদেব—চন্দ্রশেখর রোমে গিয়ে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়। ওর ক্লাসেই ছিল কার্লা ক্যাসিনি। ভেনিসের অভিজাত বংশের মেয়ে। বাবা ছিলেন কাউন্ট। কাউন্ট আলবের্তো ক্যাসিনি। কার্লা ও চন্দ্রশেখরের মধ্যে ভালোবাসা হয়। কার্লা তার বাবার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের পরিচয় করিয়ে

দেয়। এখানে বলে রাখি, চন্দ্রশেখর আয়ুর্বেদ চর্চা করেছিল। ইটালি যাবার সময় সঙ্গে বেশ কিছু শিকড় বাকল নিয়ে গিয়েছিল। কার্লার বাপ ছিলেন গাউটের রুগী। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগতেন। চন্দ্রশেখর তাকে ওষুধ দিয়ে ভালো করে দেয়। বুঝতেই পারছ, এর ফলে চন্দ্রর পক্ষে, কাউণ্টের মেয়ের পানিগ্রহণের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। ১৯১৭-তে বিয়েটা হয়, এবং এই বিয়েতে কাউণ্ট একটি মহামূল্য উপহার দেন চন্দ্রকে।

ফেলুদা—এটাই কি সেই ছবি?

জটায়ু—রেনেসাঁস?

ভূদেব—হ্যাঁ। কিন্তু এই ছবিটা সম্বন্ধে কতটা জানেন আপনারা?

ফেলুদা—ছবিটা দেখেছি, এই পর্যন্ত। মনে হয় রেনেসাঁস যুগের কোনো শিল্পীর আঁকা।

জটায়ু (বিড়বিড় করে)—বত্তিজোত্তো....দাভিঞ্চেল্লি......

ভূদেব—আপনারা ঠিকই ধরেছেন, তবে যে-কোনো শিল্পী নয়। রেনেসাঁসের শেষ পর্বের অন্যতম সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী। টিনটোরেটো।

জটায়ু—ওফ্‌ফ্‌ফ্‌ফ্‌!

ফেলুদা—টিন্‌টোরেটো নিজের আঁকা ত খুব বেশি ছবি আছে বলে জানা যায় না, তাই না?

ভূদেব—না। অনেক ছবিই আংশিক ভাবে টিনটোরেটোর আঁকা, বাকিটা এঁকেছে তার স্টুডিও বা ওয়র্কশপের শিল্পীরা। এটা তখনকার অনেক পোস্টার সম্পর্কেই খাটে। তবে কাজটা যে খুব উঁচুদরের তাতে সন্দেহ নেই। সে ছবি চন্দ্র এনে আমাকে দেখিয়েছিল। টিনটোরেটোর সব লক্ষণই রয়েছে ছবিটার। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ক্যাসিনি প্যালেসে ছিল ছবিটা।

ফেলুদা—তার মানে ওটা ত একটা মহামূল্য সম্পত্তি।

ভূদেব—ওর দাম বিশ-পঁচিশ লাখ হলে আশ্চর্য হব না।

জটায়ু (নিশ্বাস টেনে)— হিঁ ই ই ই ই ই !

ভূদেব—সেই জন্যেই ত আমি পেণ্টারের নামটা বলিনি প্রবন্ধটায়।

ফেলুদা—কিন্তু তাও বৈকুণ্ঠপুরে লোক এসে খবর নিয়ে গেছে।

ভূদেব—কে? ক্রিকোরিয়ান এসেছিল নাকি?

ফেলুদা—ক্রিকোরিয়ান? কই, নাত। ওনামে ত কেউ আসেনি।

ভূদেব—আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক। আমার কাছে এসেছিল। ওয়লটার ক্রিকোরিয়ান। টাকার কুমীর। হংকং-এর ব্যবসাদার এবং ছবির কালেকটর। বলে ওর কাছে ওরিজিন্যাল রেমব্রাণ্ট আছে, টার্নার আছে, ফ্রাগোনার আছে।

আমাদের বাড়িতে একটা বুশের-এর ছবি আছে, আমার ঠাকুরদাদার কেনা। সেটা কিনতে এসেছিল। আমি দিইনি। তারপর বলল ও আমার লেখাটা পড়েছে। জিগ্যেস করছিল নিয়োগীদের ছবিটার কথা। ও নিজে এত বড়াই করছিল যে আমি উল্টে একটু বড়াই করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বলে দিলাম টিনটোরেটোর কথা। ও ত লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে। আমি বললাম, ও ছবিও তুমি কিনতে পাবে না, কারণ পয়সার লোভের চেয়ে প্রাইড অফ পোজেশন আমাদের ভারতীয়দের অনেক বেশী। এটা তোমরা বুঝবে না। ও বললে, সে ছবি আমার হাতে আসবেই, তুমি দেখে নিও। বলেছিল নিজেই যাবে বৈকুণ্ঠপুরে। হয়ত হঠাৎ কোনো কাজে ফিরে গেছে। তবে ওর এক দালাল আছে—

ফেলুদা—হীরালাল সোমানি?

ভূদেব—হ্যাঁ।

ফেলুদা—ইনিই গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব—অত্যন্ত ঘুঘু লোক। ওকে যেন একটু সাবধানে হ্যাণ্ডল করে।

ফেলুদা—কিন্তু ও ছবি ত চন্দ্রশেখরের ছেলের সম্পত্তি। সে ত এখন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব—হোয়াট! চন্দ্রর ছেলে এসেছে? এতদিন পরে?

ফেলুদা—তাকে দেখে এলাম আমরা।

ভূদেব—ও। তাহলে অবিশ্যি সে ছবিটা ক্লেম করতে পারে। কিন্তু টিনটোরেটো তার হাতে চলে যাচ্ছে এটা ভাবতে ভালো লাগে না মিস্টার মিট্রা!

ফেলুদা—এটা কেন বলছেন?

ভূদেব—চন্দ্রর ছেলের কথা ত আমি জানি। চন্দ্রকে কত দুঃখ দিয়েছে তাও জানি। এসব কথা ত নিয়োগীরা জানবে না, কারণ চন্দ্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি। পরের দিকে অবিশ্যি ছেলের কথা আর বলতই না, কিন্তু গোড়ায় বলেছে। ছেলে মুসোলিনির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসোলিনি তখন ইটালির একচ্ছত্র অধিপতি। বেশির ভাগ ইটালিয়ানই তাকে পূজো করে। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী—শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতকার—ছিলেন মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী। চন্দ্র ছিল এদের একজন। কিন্তু তার ছেলেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। তার এক বছর আগে কার্লা মারা গেছে ক্যানসারে। এই দুই ট্র্যাজিডির ধাক্কা চন্দ্র সইতে পারে নি। তাই সে দেশে ফিরে আসে। ছেলের সঙ্গে সে কোনো যোগাযোগ রাখেনি। ভালো কথা, ছেলেকে দেখলে কেমন? তার ত ষাটের কাছাকাছি বয়স হবার কথা।

ফেলুদা—বাষট্টি। তবে এমনিতে শক্ত আছেন বেশ। কথাবার্তা বলেন না বললেই চলে।

ভূদেব—বলার মুখ নেই বলেই বলে না।... স্ত্রীর মৃত্যু ও ছেলের বিপথে যাওয়ার দুঃখ চন্দ্র কোনোদিন ভুলতে পারেনি। শেষে তাই তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটিও হয়। তাকে বলি—তোমার মধ্যে এত ট্যালেণ্ট আছে, এখনও কাজের ক্ষমতা আছে, তুমি বিবাগী হবে কেন? কিন্তু সে আমার কথা শোনেনি।

ফেলুদা—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন কি?

ভূদেব—মাঝে মাঝে একটা করে পোস্টকার্ড লিখত, তবে অনেকদিন আর খবর পাইনি।

ফেলুদা—শেষ কবে পেয়েছিলেন মনে আছে?

ভূদেব—দাঁড়াও, এই বাক্সের মধ্যেই আছে তার চিঠিগুলো। ....হ্যাঁ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭। হৃষিকেশ থেকে লিখেছে এটা।



ফেলুদা—অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে। তার মানে ত আইনের চোখে তিনি এখনো জীবিত।

ভূদেব—সত্যিই ত! এটা ত আমার খেয়াল হয়নি।

ফেলুদা—তার মানে রুদ্রশেখর এখনো তার সম্পত্তি ক্লেম করতে পারেন না।

পরদিন ভূদেব সিং গাড়িতে ঘুরিয়ে ভগওয়ানগড়ের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে দিলেন আমাদের। গড়ের ভগ্নস্তূপ, ভবানীর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ গার্ডেনস, পিথৌরি লেক, জঙ্গলে হরিণের পাল—কিছুই বাদ গেল না।

কথাই ছিল এবার শেভরোলে গাড়ি আমাদের একেবারে নাগপুর অবধি পৌঁছে দেবে, যাতে আমাদের আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঝক্কি পোয়াতে না হয়। গাড়িতে ওঠার আগে ভূদেব সিং ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

'সী দ্যাট দ্য টিনটোরেটো ডাজন্ট ফল ইনটু দ্য রঙ হ্যাণ্ডস।'

মিঃ নাগপালকে আগেই বলা ছিল; তিনি ওই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে ফেলুদাকে দিলেন, ফেলুদা সেটা সযত্নে ব্যাগে পুরে রাখল।

পরদিন এগারোটায় বাড়ি ফিরে এক ঘণ্টার মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর থেকে নবকুমারবাবুর টেলিফোন এল।

'চট করে চলে আসুন মশাই। এখানে গণ্ডগোল।'

৭

আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

'ছবিটা কি লোপাট হয়ে গেল নাকি মশাই?' যেতে যেতে জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'সেইটেই ত ভয় পাচ্ছি।'

'অ্যাদ্দিন ছবির ব্যাপারটায় ঠিক ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলুম না, জানেন। এখন বইটা পড়ে, আর ভূদেব রাজার সঙ্গে কথা বলে কেমন যেন একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করছি ওই টিরিনটোরোর সঙ্গে।'

ফেলুদা গম্ভীর, লালমোহনবাবুর ভুল শুধরোনর চেষ্টাও করল না।

এবাবে হরিপদবাবু স্পীডোমিটারের কাঁটা আবো চড়িয়ে রাখায় আমরা ঠিক দু'ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম।

নিয়োগীবাড়িতে এই তিনদিনে যেমন কিছু নতুন লোক এসেছে—নবকুমারবাবুর স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে— তেমনি কিছু লোক চলেও গেছে। চন্দ্রশেখরের ছেলে রুদ্রশেখর আজ ভোরে চলে গেছেন কলকাতা। আব বঙ্কিমবাবুও নেই।

বঙ্কিমবাবু খুন হয়েছেন।

কোনো ভাবী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়, আর তার ফলেই তাঁব মৃত্যু হয়। বেশ বেলা পর্যন্ত তাঁর কোনো হদিস না পেয়ে খোঁজাখুঁজি পড়ে যায়। শেষে চাকর গোবিন্দ স্টুডিওতে গিয়ে দেখে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে, মাথার চার পাশে রক্ত। পুলিশের ডাক্তার দেখে বলেছে মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। সময়—আন্দাজ রাত তিনটে থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে।

নবকুমারবাবু বললেন, 'আপনাকে ফোনে পাওয়া গেল না, তাই বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর দিতে হল।'

'তা ভালোই করেছেন', বলল ফেলুদা—'কিন্তু কথা হচ্ছে—ছবিটা আছে কি?'

'সেটাই ত আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আততায়ী যে কে সেটা আন্দাজ করা ত খুব মুশকিল নয়; ভদ্রলোকের হাবভাব এমনিতেই সন্দেহজনক মনে হত। বোঝাই যাচ্ছিল টাকার দরকার, অথচ আইনের পথে যেতে গেলে সম্পত্তি পেতে অন্তত ছ'সাত মাস ত লাগতই—

'আরো অনেক বেশি', বলল ফেলুদা, 'পাঁচ বছর আগেও ভূদেব সিং চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন।'

'তাই বুঝি? তাহলে ত ভদ্রলোকের কোনো লিগ্যাল রাইটই ছিল না।'

'তাতে অবিশ্যি চুরি করতে কোনো বাধা নেই।'

'কিন্তু চুরি হয়নি! ছবি যেখানে ছিল সেখানেই আছে।'

'তাজ্জব ব্যাপার,' বলল ফেলুদা। 'এ জাতীয় ঘটনা সমস্ত হিসেব-টিসেব গুলিয়ে দেয়। পুলিশে কী বলে?'

'এক দফা জেরা হয়ে গেছে সকালেই। আসল কাজ ত হল, যে চলে গেছে তাকে খুঁজে পাওয়া। কারণ, কাল রাত্রে এ বাড়িতে ছিলাম আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে, বাবা, মা, রবীনবাবু আর চাকর-বাকর।'

'রবীনবাবু ভদ্রলোকটি— ?'

'উনি প্রায় রোজ রাত দেড়টা-দুটো অবধি ওঁর ঘরে কাজ করেন। চাকরেরা ওঁর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখেছে। তাই সকাল আটটার আগে বড় একটা ঘুম থেকে ওঠেন না। আটটায় ওঁর ঘরে চা দেয় গোবিন্দ। আজও দিয়েছে। রুদ্রশেখরও যে খুব সকালে উঠতেন তা নয়, তবে আজ সাড়ে ছ'টার মধ্যে উনি চলে গেছেন। উনি আর ওঁর সঙ্গে একজন আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট?'

'আপনি যেদিন গেলেন সেদিনই এসেছেন কলকাতা থেকে। রুদ্রশেখরই গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্টুডিওর জিনিপত্রের একটা ভ্যালুয়েশন করার জন্য। সব বিক্রী করে দেবেন বলে ভাবছিলেন বোধহয়।'

'ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করে জাননি?'

'উঁহু। আমি ত জানি কলকাতায় যাচ্ছেন উকিল-টুকিলের সঙ্গে কথা বলতে: কাজ হলেই আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এখন ত আর মনে হয় না ফিবরেন বলে।'

আমরা এক তলার বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলাম। নবকুমারবাবু বোধহয় আমাদের দোতলায় নিয়ে যাবেন বলে সোফা ছেড়ে উঠতেই ফেলুদা বলল—

'রুদ্রশেখর যে ঘরটায় থাকতেন সেটা একবার দেখতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। এই ত পাশেই।'

ঘরের দক্ষিণ দিকের একটা দরজা দিয়ে আমরা মেঝেতে চীনে মাটির টুকরো বসানো একটা শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল যেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পড়েছি। এমন খাট, খাটের উপর মশারি টাঙানোর এমন ব্যবস্থা, এমন ড্রেসিং টেবল, এমন রাইটিং ডেস্ক, কাপড় রাখার এমন আলনা—কোনোটাই আর আজকেব দিনে দেখা যায় না। নবকুমারবাবু বললেন, এ ঘরটাতে আগে চন্দ্রশেখরের ভাই সূর্যশেখর—অর্থাৎ নবকুমারবাবুর ঠাকুরদাদা—থাকতেন। 'ঠাকুরদাদা শেষের দিকে আর দোতলায়

উঠতে পারতেন না। অথচ রোজ সকালে-বিকেলে মন্দিরে যাওয়া চাই, তাই একতলাতেই বসবাস করতেন।'

'বিছানা করা হয়নি দেখছি', বলল ফেলুদা। সত্যি, মশারিটা পর্যন্ত এখনো ঝুলে রয়েছে।

'সকাল থেকেই বাড়িতে যা হট্টগোল, চাকরবাকররা সব কাজকর্ম ভুলে গেছে আর কি!'

'পাশের ঘরটায় কে থাকে?'

'ওটায় থাকতেন বঙ্কিমবাবু।'

দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, কিন্তু সেটা বন্ধ। ফেলুদা রুদ্রশেখরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকল বঙ্কিমবাবুর ঘরে।

এঘরে স্বভাবতই জিনিসপত্র অনেক বেশি। আলনায় জামা-কাপড়, তার নিচে চটি-জুতো, টেবিলের উপর কিছু বই, কলম, প্যাড, একটা রেমিংটন টাইপরাইটার। দেয়ালে টাঙানো কিছু ফোটোগ্রাফ, তার মধ্যে একটা একজন সন্ন্যাসী-গোছের ভদ্রলোকের। এ ঘরেও বিছানা করা হয় নি। মশারি ঝুলে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে মশাবিটা তুলে ধরল, তার দৃষ্টি বালিশের দিকে।

বালিশটা তুলতেই তার তলা থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল।

একটা ছোট্ট নীল বাক্সের মধ্যে একটা ট্র্যাভেলিং অ্যালার্ম ক্লক।

'এ জিনিস ত আমরাও এককালে করতুম মশাই' বললেন লালমোহনবাবু। 'আমার পাশের ঘরে ছোটকাকা শুতেন; পরীক্ষার সময় অ্যালার্ম দিয়ে ভোরে উঠতুম, আর ওঁর যাতে ঘুম না ভাঙে তাই ঘড়িটা রাখতুম বালিশের নিচে।'

'হুঁ', বলল ফেলুদা, 'কিন্তু ইনি অ্যালার্ম দিয়েছিলেন সাড়ে তিনটেয়।'

'সাড়ে তিনটে!'

নবকুমারবাবু অবাক।

'এবং সেই সময়ই বোধহয় গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের স্টুডিওতে। মনে হয় ভদ্রলোক কিছু একটা সন্দেহ করছিলেন। সেই সন্দেহের কথাটাই বোধহয় আমায় বলতে চেয়েছিলেন গতবার।'

এই খুনের আবহাওয়াতেও লালমাহনবাবুর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কারণ আর কিছুই না; নবকুমারবাবুর এগারো বছরের ছেলে আর ন' বছরের মেয়ে দুজনেই বেরিয়ে গেল জটায়ুর অন্ধ ভক্ত। ভদ্রলোককে বৈঠকখানার সোফায় ফেলে দুজনেই চেপে ধরল—'একটা গল্প বলুন। একটা গল্প বলুন!'

লালমোহনবাবু খুব স্পীডে উপন্যাস লেখেন ঠিকই, তাই বলে কেউ চেপে ধরলেই যে টুথপেস্টের টিউবের মতো গল গল করে নতুন গল্প বেরিয়ে যাবে এমন ত নয়। 'আচ্ছা বলছি বলে পর পর তিনবার খানিকদূর এগোতেই ভাই বোনে চেঁচিয়ে ওঠে— 'আরে, এতো সাহারায় শিহরণ!' 'আরে, এতো হনডুরাসে হাহাকার!' এতো অমুক, এতো তমুক...

শেষে ভদ্রলোকের কী অবস্থা হল জানি না, কারণ ফেলুদা নবকুমারবাবুকে বলল যে একবার খুনের জায়গাটা দেখবে।

লালমোহনবাবুকে দোতলায় রেখে আমরা তিনজনে গেলাম চন্দ্রশেখরের স্টুডিওতে।

প্রথমেই যেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ফেলুদা থেমে গেল সেটা হল ঘরের মাঝখানের টেবিলটা।

'এর ওপর একটা ব্রঞ্জের মূর্তি ছিল না—একটা ঘোড়সওয়ার?'

'ঠিক বলেছেন। ওটা ইন্সপেকটর মণ্ডল নিয়ে গেলেন আঙুলের ছাপ নেওয়ার জন্য। ওঁর ধরাণা ওটা দিয়েই খুনটা করা হয়েছে।'

'হুঁ....

এবার আমরা তিনজনেই দক্ষিণের দেয়ালের কোণের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আজ যেন যীশুর জৌলুস আরো বেড়েছে। কেউ পরিষ্কার করেছে কি ছবিটাকে?

ফেলুদা এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে ছবিটার একেবারে কাছে দাঁড়াল। তারপর মিনিটখানেক সেটার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল।

'ইটালিতে রেনেসাঁসের যুগে মিনি-শ্যামাপোকা ছিল কি?'

'মিনি-শ্যামাপোকা?' নবকুমারবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে।

'আজকাল তিনরকম শ্যামাপোকা হয়েছে জানেন ত? মিনি, মিডি আর ম্যাক্সি। ম্যাক্সিগুলো সাদা, সবুজ নয়। মিনিগুলো রেগুলার কামড়ায়। সবুজ মিডিগুলো অবিশ্যি চিরকালই ছিল। কিন্তু ষোড়বিংশ শতাব্দীর ভেনিসে ছিল কিনা সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে।'

'ভেনিসে না হোক, এই বৈকুণ্ঠপুরে ত আছেই। কাল রাত্রেও হয়েছিল।'

'তাহলে দুটো প্রশ্ন করতে হয়,' বলল ফেলুদা, 'প্রাচীন পেন্টিং -এর শুকনো রঙে সে পোকা আটকায় কি করে, আর যে ঘরে রাত্রে বাত্তি জ্বলে না সে ঘরে পোকা আসে কি করে।'

'তার মানে—?'

'তার মানে এ ছবি আসল ছবি নয়, মিস্টার নিয়োগী। আসল ছবিতে